ভারত পেয়েছে এক যোগ্য অলরাউন্ডার

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের চাঞ্চল্যকর ক্রিকেট-জীবন

২০ মে ১৯৯৮ পনেরো টাকা

আনন্দমেলা

শুরু হল অ্যাসটেরিক্সের নতুন কমিক্স

ব্রিটেনে অ্যাসটেরিক্স

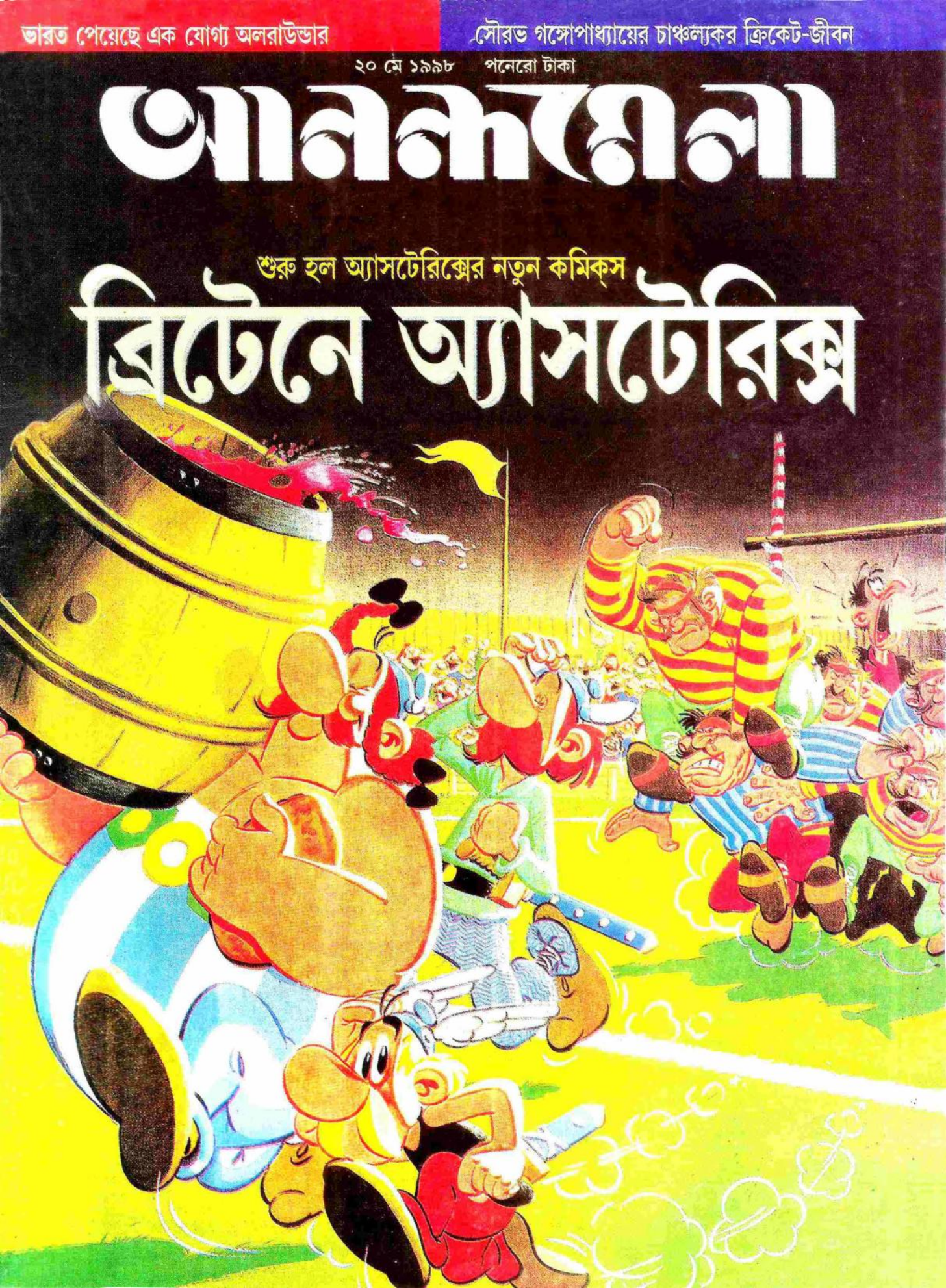

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - প্রশান্ত কর্মকার

স্ক্যান করেছেন - প্রশান্ত কর্মকার

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার দুর্লভ / বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটি স্ক্যান করতে চান বা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান

তাহলে নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

"আমার ক্লাসরুমে আমি একটা ফার্স্ট এইড বক্‌স রাখার ব্যবস্থা করেছি। আর তার মধ্যে পেটের গোলমালে উপকার পাবার জন্য রেখেছি পুদীনহরা। এটা প্রাকৃতিক। কোন সাইড এফেক্‌ট্ নেই।"

মধুমিতা দত্ত, স্কুলের শিক্ষিকা। পুদীনহরা ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে আমরা রোজই অনুরূপ প্রতিক্রিয়া জানতে পারছি।

একজন শিক্ষিকাকে অনেক রকম ভূমিকা নিতে হয়। বাবা-মা, বন্ধু, পথপ্রদর্শক। আবার কখনও বা ডাক্তার।
মধুমিতা মনে করেন ফার্স্ট এইড বক্‌স-এ পুদীনহরা রাখাটা খুবই জরুরী।
কারণ পেটের গোলমাল যে কখন হবে, তা কে বলতে পারে? আর স্বভাবতঃই স্কুলের বাচ্চাদের তো আর কোন কৃত্রিম বা রাসায়নিক জিনিস দেবার ঝুঁকি নেওয়া যায়না।

পুদীনহরা ঃ প্রকৃতির চিরসবুজ বরদান।

পুদীনহরাতে আছে মিণ্ট (পুদীনা) তেলের সংমিশ্রণ যা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত এবং অত্যন্ত কার্যকর। অন্যান্য কৃত্রিম ওষুধ যা স্নায়ুতন্ত্রে প্রভাব বিস্তার করে ও ব্যথা দমিয়ে দেয়, পুদীনহরা সেখানে পাচনতন্ত্রে স্থানীয়ভাবে কাজ করে ও ব্যথা কমিয়ে আরাম দেয়। তাছাড়া পুদীনহরায় আছে চমৎকার *এ্যাণ্টিস্প্যাসমোডিক (যন্ত্রণা উপশমকারী), কারমিনেটিভ (গ্যাস নিবারণকারী) এবং হজমশক্তির গুণ।*

পুদীনহরা ঃ কার্যকরী অথচ কোনো সাইড এফেক্‌ট নেই।

সারা বিশ্বে এখন রাসায়নিক পদার্থের সাইড এফেক্‌ট নিয়ে গভীর উদ্বেগ বেড়ে চলেছে। সত্যি বলতে কি এর মধ্যে কিছু কিছু ওষুধ সম্প্রতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পুদীনহরা হ'ল এমন এক প্রাকৃতিক উপচার যার কোনো সাইড এফেক্‌ট নেই।

একবার পুদীনহরা ব্যবহার করুন। আপনি সর্বদা এতেই ভরসা করবেন।

যেমন করেছেন মধুমিতা দত্ত এবং আরও লক্ষ লক্ষ পুদীনহরা ব্যবহারকারীগণ।

Pudin® Hara লিক্যুইড এবং পার্ল্‌স্

✔ সঠিক এফেক্‌ট,
নেই সাইড এফেক্‌ট,

HTA.5720.98.BEN

Dabur

For more information on Pudin Hara, write in with your name, sex, date of birth, education, profession, complete address and phone no. to:
Dabur Pudin Hara (AM), P.O. Box 7326, New Delhi - 110 065.

আনন্দমেলা

২৪ বর্ষ ৩ সংখ্যা ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫ ২০ মে ১৯৯৮

১২ ব্রিটেনে অ্যাসটেরিক্স

গোসিনির লেখায় ও ইউদেরজোর আঁকায় 'অ্যাসটেরিক্স' কমিক্স সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ পাঠকের মন জয় করেছে। অ্যাসটেরিক্স বাংলায় প্রথম প্রকাশিত হয় 'আনন্দমেলা' পত্রিকায়। মূল ফরাসি থেকে অনূদিত এই কমিক্স ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশের সময় থেকেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মূল অ্যাসটেরিক্স কমিক্স বইগুলির প্রথম প্রকাশের কালানুক্রমিক সূচি অনুযায়ী এবার শুরু হচ্ছে নতুন কাহিনী 'ব্রিটেনে অ্যাসটেরিক্স'।

২০ গল্পও করা যাবে কম্পিউটারের সঙ্গে

কম্পিউটারের 'কি' টিপতে হবে না, 'মাউস' টেপারও দরকার নেই। মুখের কথাই যথেষ্ট। ব্যস, সামনে রাখা কম্পিউটার 'জবাব দেবে' আমাদের ভাষাতেই। কী করে এটা সম্ভব ? 'ভয়েস রেকগনিশন সফ্‌টওয়্যার'-ই বা কী ? মানুষের ভাষা কম্পিউটারকে শোনানো ও বোঝানোর কাজটা কারা করছেন ? জানিয়েছেন ঈশানী দত্ত রায়।

২৮ অজিত আগরকর

ভারতীয় ক্রিকেটে একসময় ফাস্ট বোলারের অভাব ছিল। এখন নেই। জাভাগল শ্রীনাথ, বেঙ্কটেশ প্রসাদ, আবে কুরুভিল্লা, দেবাশিস মোহান্তি ও হরবিন্দার সিংহের পর এখন নতুন নাম অজিত আগরকর। লিখেছেন অমিতাভ মজুমদার।

আগামী আকর্ষণ

বিশ্বকাপ ফুটবল ১৯৯৮ : বিশেষ সংখ্যা

লিখেছেন চুনী গোস্বামী, অমল দত্ত, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যজিৎ চ্যাটার্জি, ভাইচুং ভুটিয়া, মিঠুন চক্রবর্তী, সুমন চট্টোপাধ্যায়, তানাজি সেনগুপ্ত, সব্যসাচী সরকার, রূপক সাহা, রতন চক্রবর্তী, প্রতাপ জানা।

বিশেষ নিবন্ধ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

ফুটবলের গল্প : বিমল কর, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত।

আরও আকর্ষণ : তারকাদের বিশ্বকাপ ও রঙিন পোস্টার।

এ ছা ড়া ও

সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)

জাম্বো ডিমের অন্দরে তপন সেন ৩১

ধারাবাহিক উপন্যাস

মা, আমার মা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৪

ভাঙা ডানার পাখি সুচিত্রা ভট্টাচার্য ৪৪

গল্প

হুঁকোডাইল রামকুমার মুখোপাধ্যায় ১৬

সোনালি মাছ শুভাশিস মৈত্র ৫১

বিশেষ প্রতিবেদন

ক্যান্সার সারানোর নতুন ওষুধ...সুব্রত রায় ৮

কেরিয়ার গাইড

হিউম্যান বায়োলজি...অমর দাশ ৫৬

কাছে-দূরে

ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে কর্ণগড় জগন্নাথ ঘোষ ৬৩

ধারাবাহিক রচনা

লর্ডস থেকে ঢাকা সব্যসাচী সরকার ৪৭

খেলাধুলো

অনেকদিন পরে ভারত পেয়েছে...চিন্ময় রায় ২৯

বাংলার আর-এক ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন সুজন ঠাকুরতা ৩০

নিয়মিত কমিক্স

অ্যাসটেরিক্স : দুই প্রধানে ধুন্ধুমার ১১ **আর্চি** ১৫ **টিনটিন : আশ্চর্য উল্কা** ১৮ **অরণ্যদেব** ২২ **ম্যানিটোবা জাহাজের রহস্য** ২৬ **টারজান** ৫৪ **ডাঃ রেক্স মর্গান** ৫৮ **গাবলু** ৬২

নিয়মিত বিভাগ

কবিতা ৬ **বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে** ২৪ **শব্দসন্ধান** ৪৬ **বিজ্ঞান : গবেষণা** ৬১ **কুইজ** ৬৭ **বাইরের জানালা** ৭০ **ধাঁধা-হেঁয়ালি খামখেয়ালি** ৭৩ **বিশ্ববিচিত্রা** ৯

সম্পাদক

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

এবিপি লিঃ-এর পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম ১৫ টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা, উত্তর-পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

ধারাবাহিক উপন্যাস

মা আমার মা

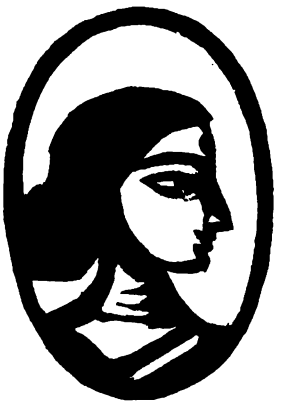

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সাত

পুলিনের ইস্কুলে যাওয়া হয়নি দু'দিন। যাবে কী করে, বাড়িতে মা যদি সর্বক্ষণ কাঁদেন, তা হলে কি কেউ স্কুলে যেতে পারে? মায়ের কান্নায় কোনও আওয়াজ হয় না, শুধু দু'চোখ দিয়ে জল গড়ায়। বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে থাকেন মা, উঠতে চান না, কিছু খেতেও চান না। ছোট বোন লতা মাকে ওঠাবার চেষ্টা করে, মা যেন লতার কথা শুনতেই পান না, চেয়ে থাকেন দূরের দিকে। একটু পরে লতাও কাঁদতে শুরু করে।

দাদাকে সেই যে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল, আর ছাড়েনি।

বাবা কোথায় আছেন তার ঠিক নেই, দাদাও নেই। মা মাঝে-মাঝে নিজের মনেই বলে ওঠেন, 'আমি এখন কী করব? হে ভগবান, আমাকে বলে দাও!'

জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বিপিন ঝগড়া করেছিল, তাই জ্যাঠামশাইরা খোঁজখবর নিতে আসেন না। পাড়ার কোনও লোকই আসেনি এ-বাড়িতে। যে-বাড়ির কোনও লোককে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়, সে-বাড়ির কারও সঙ্গে কথা বলতেও অন্যরা ভয় পায়।

পুলিনদের সাহায্য করবার আর কে আছে? এখানে কেউ নেই। এই সময় মনে পড়ে বড়মামার কথা। বড়মামা খুব ভালমানুষ। মাকে খুব ভালবাসেন। একবারই মাত্র এসেছিলেন এ গ্রামে। কত আদর করেছিলেন পুলিনকে আর লতাকে। জিনিসপত্রও এনেছিলেন অনেক।

এই বিপদে বড়মামা নিশ্চয়ই সাহায্য করতেন। কিন্তু তিনি যে থাকেন অনেক দূরে। অসমের কোন পাহাড়ে। সেখানে চিঠি যেতেই লাগে অনেকদিন।

পুলু খালি ভাবে, পুলিশ দাদাকে ধরে নিয়ে গেল কেন? দাদার তো কোনও দোষ নেই, দাদা কিছু জানেই না। দাদা ওই মৃত লোকটিকেও চেনে না। ধরা উচিত ছিল তাকে। সে লোকটিকে চেনে, পুলিশ যে-জিনিসটা খুঁজতে এসেছিল, সেটা পুলুই লুকিয়ে রেখেছে। তবু পুলিশ তাকে গ্রাহ্যই করল না, তার বয়েস কম বলে!

দাদার জন্য কষ্ট হয়, মানে কাঁদতে দেখলে কষ্ট হয়, তবু তার মধ্যে খিদেও পায়। খাওয়ার কথা যেন মায়ের মনেই নেই। বাড়িতে মুড়ি, চিঁড়ের মোয়া আর আমসত্ত্ব যা ছিল, দু'দিনে দুই ভাইবোন তা খেয়ে শেষ করে দিল। তবু ভাত না খেলে কি খিদে মেটে?

মা রাত্তিরে ঘরে শুতেও যাননি, ওই বারান্দাতেই ঠায় একভাবে বসে থেকে রাত কাটিয়ে দিলেন।

পরদিন সকালে লতা বলল, "এ ছোড়দা, আমি ভাত রান্না করতে পারি। তুই ঘুঁটে দিয়ে উনুন ধরাতে পারবি?"

পুলু সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, পারব।"

যদিও পুলু কোনওদিনই উনুন ধরায়নি, তবু ভাত খাওয়ার চিন্তাতেই এত আনন্দ হল যে, মনে-মনে ভাবল, উনুন ধরানো আর এমন শক্ত কী?

লতা বলল, "আমি ভাতের ফ্যান গালতে জানি না কিন্তু। ফ্যানা ভাত খেতে হবে।"

পুলু বলল, "ফ্যানা ভাত খুব ভাল!"

লতা বলল, "কী দিয়ে ফ্যানা ভাত খাব? শুধু নুন দিয়ে? আমি বাপু বেগুন ভাজতে পারব না। গায়ে গরম তেল ছিটে আসে। তুই যদি ডাল রেঁধে দিস—"

পুলু কী করে ডাল রাঁধবে, সে কোনওদিন হাঁড়ি-কড়াই ছুঁয়েও দেখেনি। তা ছাড়া ছেলেরা কি রাঁধে নাকি, ওটা তো মেয়েদের কাজ!

এ-কথা ভাবার পরই তার মনে পড়ল, বাবা ভাল রাঁধতে জানেন। একবার মায়ের খুব অসুখ হয়েছিল, বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারতেন না, তখন বাবা সাতদিন রান্না করেছিলেন। খুব ভাল ভাল জিনিস খাওয়া হয়েছিল তখন।

পুলুর আরও মনে পড়ল, কড়াইতে না চাপিয়েও ডাল খুব সহজভাবে রান্না করা যায়। সে দেখেছে, মা খানিকটা ডাল একটা ন্যাকড়ায় পুঁটলি বেঁধে ভাতের মধ্যে ফেলে দেন, ভাত সেদ্ধ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ডালও সেদ্ধ হয়ে যায়। তারপর ভাতে একটু সরষের তেল মেখে খেতে চমৎকার লাগে।

তা হলে আর ডাল আলাদা করে রান্না করতে হয় না, ফাঁকতালে হয়ে যায়। ফ্যানা ভাতের মধ্যে আলু সেদ্ধও হতে পারে।

কিন্তু উনুন ধরাতে গিয়ে দেখা গেল, কাজটা মোটেই সহজ নয়। তলার দিকে ঘুঁটে আর ওপরের দিকে কাঠ। দেশলাইকাঠি জ্বেলে-জ্বেলে কিছুতেই ধরানো যায় না ঘুঁটে। একটা পাটকাঠি জ্বেলে নেওয়া হল, তা দিয়ে ধরাতে গেলেও একটু পরে নিভে যায়। ফুঁ দিতে গেলেই ধোঁয়া বেরোয় গলগল করে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে দুই ভাইবোন উনুন ধরাবার নামে একেবারে গলদঘর্ম! হঠাৎ একসময় জানলার ধারে কে যেন হি-হি করে হেসে উঠল।

পুলু তাকিয়ে দেখল, জানলার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে বিন্তিদিদি।

বিন্তিদিদি ওদের জ্যাঠতুতো দিদি। একসময় বিন্তিদিদি এইদিকেই থাকত প্রায় সব সময়। মায়ের সঙ্গে খুব ভাব ছিল। কিন্তু বিন্তিদিদির বিয়ে হয়ে গেছে তিন বছর আগে, থাকে কাঁথিতে। বিন্তিদিদি ফিরে এল কবে ?

দুই ভাইবোন যদিও একসময় খুবই ভালবাসত বিন্তিদিদিকে, কিন্তু এখন তাঁকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল। জ্যাঠামশাই বলে দিয়েছেন, তারা কেউ ওদিকে যেতে পারবে না, ও-বাড়ির কেউ এদিকে আসবে না। বিন্তিদিদি বোধ হয় জানে না সে-কথা।

বিন্তি হাসি থামিয়ে বলল, "এই, তোরা দু'টোতে কী করছিস রে ? রান্নাবাড়ি খেলছিস ? ইস, চোখগুলো যে পাকা করমচার মতন লাল হয়ে গেছে !"

ওরা কোনও উত্তর দিল না।

পেছন দিক দিয়ে ঘুরে রান্নাঘরের মধ্যে চলে এল বিন্তি। তার হাতে শালপাতায় ঢাকা একটা বড় মাটির খুরি। সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এই নে, আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে খোয়া ক্ষীর এনেছি। তোরা খাবি !"

খোয়া ক্ষীরের নাম শুনলেই জিভে জল এসে যায়। ওঃ কী ভাল খেতে। কিন্তু মা যে বারণ করে দিয়েছেন। জ্যাঠামশাইদের বাড়ির কোনও জিনিস নেওয়া হবে না। জ্যাঠামশাই বাবাকে কুলাঙ্গার বলেছেন।

বিন্তিদিদির শ্বশুরবাড়ির জিনিস কি জ্যাঠামশাইদের বাড়ির জিনিস ?

হাঁড়িতে অত চাল আর একটা থালায় মুসুরির ডাল দেখে বিন্তি জিজ্ঞেস করল, "তোরা সত্যি সত্যি রান্না করতে বসেছিস ? ও মা ! কেন রে ? কাকিমার কী হয়েছে ? অসুখ ?"

লতা বলল, "না, মা কাঁদছে।"

বিন্তি ভুরু কুঁচকে বলল, "কেন, কাঁদছে কেন ?"

লতা বলল, "দাদাকে যে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।"

বিন্তি বলল, "হ্যাঁ, শুনলাম তো এসেই। কেন, কী করেছে বিপু ?"

লতা বলল, "কিচ্ছু করেনি। এমনি-এমনি ধরে নিয়ে গেল !"

বিন্তি আর বিপিন ঠিক এক বয়েসী। একসময় ওরা খেলা করতে-করতেই খুব মারামারি শুরু করে দিত। বিন্তিই জিতে যেত অনেক সময়।

বিন্তি বলল, "জানি, বিপুটা তো একটা ভিতুর ডিম, ও আবার কী করবে ! আজকাল এমনি-এমনিই অনেক ছেলেকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কাঁথিতে তো পুলিশের ভয়ে অনেক ছেলে বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে ! চল তো, কাকিমাকে দেখে আসি !"

মা সেই একই রকম ভাবে বারান্দায় বসে আছেন পাথরের মূর্তির মতন। বিন্তি তাঁর পাশে বসে গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "কাকিমা, কে এসেছে দ্যাখো।"

মা মুখ ফিরিয়ে দেখলেন। প্রথমে যেন চিনতেই পারলেন না। তারপর এই প্রথম উঁচু গলায় কেঁদে উঠে বললেন, "বিন্তি, ওরে বিন্তি রে, আমার কী হবে ? আমি কী করে বাঁচব ?"

বিন্তি প্রথমে কিছুক্ষণ কাকিমাকে কাঁদতে দিল। তারপর এক ধমক দিয়ে বলল, "তোমার কী আক্কেল গো ! ছোট ছেলেমেয়ে দুটো হাত পুড়িয়ে রাঁধতে গেছে, আর তুমি এখানে বসে ভেউ-ভেউ করে কাঁদছ ?"

মা বললেন, "বিন্তি, আমাদের এখন কী হবে ? আমার স্বামী কাছে নেই, বিপুকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়ে মারছে..."

বিন্তি জিজ্ঞেস করল, "ছোটকাকা কোথায় ?"

মা বললেন, "জানি না। সত্যি জানি না রে, কোথায় কোথায় ঘুরছেন তিনি। বাড়ির বড় ছেলেটা..."

বিন্তি বলল, "বিপুকে পুলিশে মারছে কী করে জানলে ? কে বলেছে ? কেন মারবে ? ও কিছু দোষ করেনি। এমনিই সন্দেহ করে ধরে নিয়ে গেছে, দু'দিন পরে ছেড়ে দেবে ! এরকম অনেক ছেলেকেই ধরছে, তমলুকে একটা থানা জ্বালিয়ে দিয়েছে কি না !"

কবিতা

চিরকিশোর

সুপ্রিয় বাগচী

ঘনাদাও লজ্জা পাবেন ঘোঁতনমামার গপ্পো শুনে
হিটলারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর দেরহাদুনে।
তাঁরই দেওয়া ইয়র্কারে আউট হয়েছিলেন মারাদোনা
সোবার্স তখন পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, 'শাবাশ মনা'।

আইনস্টাইনকে শিখিয়েছিলেন মণিপুরী এবং কথক
বরিস বেকারকে খেয়াল ঠুংরি, সঙ্গে কিছু মিড় ও গমক।
শেক্সপিয়রের সঙ্গে কফি খেয়েছিলেন পেন্টাগনে
কালিদাস তাঁর সহপাঠী এ-কথা বলো কে না জানে ?

মুসোলিনিকে দীক্ষা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন ইন্দোচিনে,
কোপারনিকাস এসেছিলেন ভারতে তাঁর আমন্ত্রণে।
চার্চিলকে তিনিই প্রথম শিখিয়েছিলেন ধ্রুপদ ধামার,
বানিয়েছিলেন তিনিই সিঁড়ি মহাকাশে ওঠা-নামার।

সেদিন দেখা ঘনাদার সঙ্গে একটা মস্ত সভায়
হাসতে-হাসতে বলেছিলেন— "টেক্কা তুমি দিলে আমায় !"
প্রণাম করে তখন নাকি বলেছিলেন ঘোঁতনমামা,
"আপনি তো সার চিরকিশোর, আমি সবে দিচ্ছি হামা।"

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

মা বললেন, "ছেড়ে দেবে ? যদি না দেয় ?"

বিন্তি বলল, "দেবে না মানে ? এ কী মগের মুল্লুক নাকি ? ব্রিটিশ রাজত্বে আইনকানুন নেই ? দেখো, কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। কাল না হয় আমার বরকে একবার থানায় খবর নিয়ে আসতে বলব। অত ভয় পাচ্ছ কেন কাকিমা, আমরা তো আছি !"

এরকম সহানুভূতির কথা শুনলে মানুষের কান্না আরও বেড়ে যায়। মা বিন্তিকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ কাঁদলেন।

তারপর চোখ মুছে উঠে গেলেন রান্নাঘরে।

পেটভরে ভাত খেল পুলু। বিন্তিদিদি সারা দুপুর রয়ে গেল মায়ের কাছে। জ্যাঠামশাই যতই রাগ করে থাকুন, বিন্তিদিদিকে শাসন করতে পারবেন না। বিন্তিদিদি খুব তেজী।

দুপুরবেলা বাড়ি থেকে বেরোল বিপিন।

ইস্কুলে না গেলে তার ভাল লাগে না। ইস্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে আর কোথায় দেখা হবে ? কিন্তু এখন প্রায় ছুটির সময়, এখন তো যাওয়া যায় না ইস্কুলে।

পুলু এমনি-এমনি হাঁটছে। খালধারের জঙ্গলে যেতে তার ভাল লাগে। যেখানে কেউ থাকে না, সেখানে সে একা-একা কথা বলে। মুখস্থ করা কবিতা আওড়ায়। বাবা তাকে অনেক কবিতা মুখস্থ করিয়েছেন। তার সবচেয়ে প্রিয় এই কবিতাটা :

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কর রে লোপাট
রক্তজমাট শিকল পূজার
পাষাণবেদী
ওরে ও পাগলা ভোলা
দেরে দে প্রলয় দোলা...

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন পুলুর কাঁধে হাত রাখল। মুখ ফিরিয়ে আচমকা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল সে।

সেই বলাই !

আজ তার সঙ্গে কেউ নেই, কিন্তু তার যা গায়ের জোর, একাই সে পুলুকে মেরে তুলোধোনা করে দিতে পারে।

বলাই চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "তোর দাদাটাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, না রে ?"

পুলু চুপ করে রইল।

বলাই আবার বলল, "কী চুরি করেছিল ?"

পুলু অসহায়ভাবে দু'দিকে মাথা নাড়ল।

বলাই বলল, "আলবাত চুরি করেছিল। বলেছিলাম না, তোর বাবাটা ডাকাত, আর তোর দাদাটা চোর। না হলে পুলিশে ধরবে কেন ? এর পর তোর বাবাকেও ধরবে !"

আগের দিন বাবা সম্পর্কে খারাপ কথা শুনে পুলু অন্ধ রাগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বলাইয়ের ওপর। আজ আর সেরকম জোর পেল না। বাবার ওপরই তার অভিমান হচ্ছে। বাবা কেন একবারও বাড়ি আসেন না ? কেন চিঠি লেখেন না ? দাদাকে যে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, সে-কথা জানতেও পারলেন না বাবা।

কাতর মুখ করে পুলু বলল, "বলাইদা, আমাকে তুমি মারবে তো ? মারো !"

বলাই এবার ভুরু কুঁচকে বলল, "কেন, তোকে মারব কেন ?"

পুলু বলল, "সেদিন আমি আর নেত্য তোমাকে মেরেছিলাম। তুমি তার শোধ নেবে, মারো ! জামাটা ছিঁড়ে দিয়ো না। আমার আর মোটে একখানা জামা আছে।"

বলাই সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "আগের দিনেরটা শোধবোধ হয়ে গেছে। নেত্যকে দিয়েছি দুই রদ্দা। ওরই তো দোষ বেশি। আমি তো ওর বাবার নামে কোনও দোষ দিইনি। তবু ও আমার গায়ে হাত তুলেছিল কোন সাহসে! যাকগে থাক। তোদের বাড়িতে যে পুলিশ এসেছিল, তখন পুলিশ তোকে মেরেছে?"

পুলু বলল, "না। আমাকে বকেওনি।"

বলাই জিজ্ঞেস করল, "শুধু তোর দাদাকে ঠেঙিয়েছে?"

পুলু বলল, "না, দাদাকেও তো মারেনি। শুধু ধরে নিয়ে গেল।"

বলাই বলল, "থানায় নিয়ে গিয়ে রুল দিয়ে খুব পেটাবে। কথা আদায় করার জন্য পা দুটো বেঁধে উলটো করে ঝুলিয়ে দেয়। তারপর হাতের আঙুলে পিন ফোটায়—"

পুলু জোর দিয়ে বলল, "দাদা তো কিছু জানে না!"

বলাই বলল, "তোর দাদা যে কিছু জানে না, তা তুই কী করে জানলি? সে কি সব কথা তোকে বলে? তুই তোর বাবার কোনও খবর পেয়েছিস?"

পুলু আবার চুপ করে রইল।

বলাই এবার বন্ধুর মতন পুলুর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "তোরা খুব বিপদে পড়েছিস, তা কি আমি বুঝি না? গ্রামসুদ্ধু লোক বলাবলি করছে, 'আহা, ওদের এখন কী হবে? পুলিশে ছুঁয়েছে, এখন তো মুদিখানাতেও ধার দেবে না।' সেইজন্যই তো তোকে আজ আমি মারলাম না, বুঝলি? তোরা বিপদে পড়েছিস বলে। না হলে খুব পিটুনি দিতাম। এখন একটা কথা বলছি শোন। তোর বাবা কোথায় আছে জানতে চাস? আমি বলে দিতে পারি।"

পুলু এমনই অবাক হয়ে গেল যে, তার চোখদুটো যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসবে। সে তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে বলল, "ব-বলাইদা, তু-তুমি আমার বাবার কথা জানো? বাবা কোথায় আছে?"

বলাই বলল, "ধুত, আমি জানব কী করে? কিন্তু যে জানে, আমি তার নাম বলে দিতে পারি। তুই তার কাছে যা।"

"কে?"

"বিশ্বনাথবাবু?"

"বিশ্বনাথবাবু... মানে ইতিহাসের সার?"

"হ্যাঁ। তোর বাবার নাম আর ওঁর নাম তো এক। আমার বাবা একদিন বলছিলেন, ওই দুই বিশ্বনাথ একই দলের! ইতিহাসের মাস্টারটার জন্য কোনদিন না ইস্কুলে পুলিশ এসে হাজির হয়!"

"কেন, ইতিহাসের সার কী করেছেন?"

"সে তুই বুঝবি না। এখনও ছোট আছিস তো!"

বলাই মাত্র এক ক্লাস উঁচুতে পড়ে, তবু সে বড়দের মতন ভারিক্কি ভাব এনে গলার আওয়াজ গম্ভীর করে ফেলল, সে আবার বলল, "সাবধান, খুব গোপনে দেখা করবি। কেউ যেন জানতে না পারে।"

পুলুর যেন তর সইছে না। এক্ষুনি ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে। সে বলল, "তা হলে এখন যাই?"

বলাই বলল, "এখন না, সন্ধের পর। ইস্কুলের বদলে সারের বাড়িতে দেখা করাই ভাল। লুকিয়ে লুকিয়ে যাবি। আর-একটা কথা জেনে রাখ, পুলু। জিতেন সাঁতরাকে চিনিস তো? ওই যে আমাদের ইস্কুলের কাছেই যার মুদির দোকান? বাবার কাছে শুনেছি, ওই জিতেনটা পুলিশের চর। সব গ্রামেই এখন পুলিশের চর আছে একজন-দু'জন। ওই জিতেন যদি তোর পেট থেকে কথা বার করার চেষ্টা করে, কিচ্ছু বলবি না।"

পুলু একটু চুপ করে থেকে বলল, "আচ্ছা বলাইদা, এখন আমি তা হলে বাড়ি যাই?"

বলাই আবার হেসে বলল, "দাঁড়া, দাঁড়া, এই যে আমি তোকে আজ একা পেয়েও মারলাম না, তোর বাবার একটা সন্ধান দিয়ে দিলাম, এসব কি এমনি-এমনি? এর বদলে তুই কী দিবি?"

পুলু খানিকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল, "এর বদলে আমি কী দেব? আমার কাছে তো পয়সা নেই!"

বলাই বলল, "দুর গাধা। তোর পয়সা নেই, তা তো আমি জানিই। তোরা তো গরিব। দুটোর বেশি জামা নেই। পেটভরে খেতে পাস না। তা বললে তো চলবে না। কিছু তো দিতেই হবে।"

বলাই একটা কাটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসল। তারপর পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে বলল, "আমার পা টেপ। যতক্ষণ আমি থামতে না বলব ততক্ষণ টিপ্‌বি। একে বলে গায়ে-গায়ে শোধ।"

পুলু হাঁটু গেড়ে বসে বলাইয়ের পা টিপতে শুরু করে দিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল বলাই। পুলু পা টিপেই চলেছে। আবার একটু বাদে চোখ মেলে বলাই বলল, "যা যা, যথেষ্ট হয়েছে। এবার ভাগ!"

সবেমাত্র বিকেল হয়েছে। এখনও সন্ধে হতে অনেক দেরি। তবু চুম্বকে যেমন লোহা টানে, সেইরকম টানে পুলু ছুটে গেল ইতিহাসের সারের বাড়ির দিকে।

স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। মাস্টারমশাইদের বাড়িই ছাত্ররা চেনে। সব মাস্টারমশাই এই গ্রামের লোক নন। যাঁরা বাইরে থেকে চাকরি করতে এসেছেন, তাঁদের নিজস্ব কোনও বাড়ি নেই। এ-গ্রামে বাড়ি ভাড়াও পাওয়া যায় না। কোনও-কোনও বাড়িতে মাস্টারমশাইদের এক-একজনকে থাকতে দেওয়া হয়। তার বদলে মাস্টারমশাইরা সে-বাড়ির ছেলেদের আলাদা করে পড়ান।

বিশ্বনাথবাবু থাকেন গড়াইদের বাড়িতে। সে-বাড়িতে কোনও ছোট ছেলেমেয়ে নেই। তবু তাঁরা বিশ্বনাথবাবুকে রেখেছেন, একটা ঘর দিয়েছেন পুকুরধারে। সে-ঘরখানা আসল বাড়ি থেকে একটু দূরে। মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। বিশ্বনাথবাবু বিয়ে করেননি, একলা থাকেন। নিজে রান্না করে খান। ঘরটার সামনে একচিলতে বারান্দা, সেখানেই উনুন পাতা। পুলু আগে কখনও বিশ্বনাথবাবুর কাছে আসেনি, কিন্তু একটা ছুটির দিনে এদিক দিয়ে যেতে-যেতে দেখেছিল, বিশ্বনাথবাবু রান্না করছেন, আর তাঁর কোলে একখানা বই খোলা। একবার রান্নার দিকে মন দিচ্ছেন, আবার একটু বই পড়ে নিচ্ছেন। খুব মজা লেগেছিল।

বিশ্বনাথবাবু স্কুল থেকে ফিরে এসেছেন, ঘরের মধ্যে আছেন, তা বুঝতে পারছে পুলু। তবু সে কাছে গেল না। বসে রইল পুকুরের ধারে।

আস্তে-আস্তে আকাশ থেকে মিলিয়ে গেল দিনের আলো। আরও ছোট বয়েসে পুলু ভাবত যে, সুয্যি ঠাকুর সন্ধেবেলা ঘুমোতে যান, তাই তখন রাত্তির হয়। এখন অবশ্য সে জানে যে সূর্যের সামনে পৃথিবী ঘুরছে, তার একপিঠে যখন দিনের আলো, অন্যদিকে তখন রাত্তিরের অন্ধকার। ভূগোল-বইয়ে এসব লেখা থাকলেও সূর্য ঘুমোতে যাচ্ছেন, এটা ভাবতেই বেশি ভাল লাগে।

সব পাখির ডাক থেমে গেছে অনেক আগে। একটা লিচু গাছে উড়ে এসে বসল কয়েকটা বাদুড়। খানিকটা ঝটাপটি শোনা গেল।

তারপর বিশ্বনাথবাবুর বারান্দায় উনুনের আগুন জ্বলে উঠতেই পুলু এগিয়ে গেল সে দিকে। কিন্তু সারকে ডাকতে তার লজ্জা করছে। যদি বলাইয়ের সব কথাটাই মিথ্যে হয়? হয়তো পুলুকে বোকা বানাবার জন্য সে ওইসব বলেছে। পুলু দাঁড়িয়েই রইল উঠোনে।

একসময় বিশ্বনাথবাবু মুখ তুলে বললেন, "কে? কে ওখানে?"

ছবি : সুব্রত চৌধুরী *(ক্রমশ)*

বিশেষ প্রতিবেদন

ক্যান্সার সারানোর নতুন ওষুধ আবিষ্কারের দাবি জানালেন মার্কিন বিজ্ঞানী

ক্যান্সারের চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে 'অ্যানজিওস্ট্যাটিন' ও 'এনডোস্ট্যাটিন'। মার্কিন বিজ্ঞানী জুডা ফোকম্যান-এর গবেষণায় মিলেছে ক্যান্সার নিরাময়ের এক অভিনব উপায়। আলোচনা করেছেন সুব্রত রায়

গত প্রায় তিন দশক ধরে নিরন্তর চেষ্টার ফসল শেষপর্যন্ত বিজ্ঞানীদের উল্লসিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা রিচার্ড ক্লাউনজারের ভাষায় কর্কট রোগের চিকিৎসা বিষয়ে এ-পর্যন্ত যত গবেষণা হয়েছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহের খবর হল 'অ্যানজিওস্ট্যাটিন' এবং 'এনডোস্ট্যাটিন'। এই দুটি বিশেষ প্রোটিনের সাহায্যে ইঁদুরের 'টিউমার' সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করা সম্ভব। বস্টন চিলড্রেন হসপিটালের গবেষক জুডা ফোকম্যান এবং তাঁর সহকারী মাইকেল ও'রেলি এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করেছেন। অ্যানজিওস্ট্যাটিন হল রক্ততঞ্চনকারী 'প্লাজমিনোজেন'। আর এনডোস্ট্যাটিন ভিন্ন শ্রেণীর 'কোলাজেন ১৮' প্রোটিন। ক্যান্সার বেড়ে ওঠার জন্য চাই প্রচুর পরিমাণে খাবার। টিউমার অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে শুরু করার সময় রক্তবাহী নালীর বেষ্টনী তৈরি করে নিজের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ অটুট রাখে। বিশেষ ওষুধ প্রয়োগে যদি এই রক্ত নালিকাগুলি শুকিয়ে টিউমারে খাবার পৌঁছনো বন্ধ করা যায়, তবে তার ফল হবে অব্যর্থ। খাদ্যাভাবে ক্যান্সার কিছুতেই ক্যালোজিরা দানার বেশি বড় হতে পারবে না। এবং কিছুদিনের মধ্যে ক্রমশ তা ছোট হতে হতে সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যাবে। টিউমারে রক্তনালী শুকিয়ে ফেলার কাজে অ্যানজিওস্ট্যাটিন এবং এনডোস্ট্যাটিনের জুড়ি নেই। সৌভাগ্যের কথা, মানবদেহেও এই বিশেষ প্রোটিন দুটি পাওয়া যায়। এ-খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই অজস্র ক্যান্সার রোগী ও চিকিৎসক ফোকম্যানের ওষুধের খোঁজ শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে ব্যবসায়িকভাবে ওষুধ দুটি তৈরির কাজে নেমে পড়েছে রকভিল মেরিল্যান্ডের এনট্রিমিড ইন্ক. নামে একটি 'বায়োটেকনোলজি' কম্পানি। এনট্রিমিডের প্রতিষ্ঠাতা জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিনের ডিন এবং প্রোফেসর বার্ট বের্নো। তাঁর মতে, ক্যান্সার চিকিৎসায় এই অভাবনীয় সাফল্য এক নতুন দিগন্তের দিশারী।

আপাতত ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের চিকিৎসক জেম্‌স প্লুডা-র তত্ত্বাবধানে মানবদেহে এই দুটি ওষুধের উপকারিতা বিষয়ে পরীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম ধাপে চূড়ান্ত পর্যায়ের কর্কট রোগীদের ওপর অ্যানজিওস্ট্যাটিন ও এনডোস্ট্যাটিন প্রয়োগ করা হবে। প্লুডার মতে, ফোকম্যানের গবেষণার তথ্য 'অসাধারণ'। নতুন ওষুধ দুটির নিরাময় গুণ জেনে চিকিৎসকেরা বিস্ময়ে প্রায় অভিভূত হয়ে গেছেন। গবেষণার সাফল্য শতকরা ১০০ ভাগ। ১০টি ইঁদুরের ১০টিতেই বৃহদাকার ক্যান্সার টিউমার নির্মূল হয়ে গেছে। মানুষের দেহে এই ধরনের টিউমার এক কিলোগ্রাম ওজন অবধি বড় হতে পারে। কেবল একবার পরীক্ষা নয়। ১৯৯১ সাল থেকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একই সুফল পাওয়া গেছে। ফোকম্যানের ওষুধের আর একটি গুণ হল ওর ব্যবহারে 'মেটাস্টেসিস' হয়ে দেহের অন্যত্র ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা নেই। তা ছাড়া 'কেমো' বা 'রেডিয়েশন থেরাপি'র মতো ফোকম্যানের চিকিৎসায় নেই কোনও বিপজ্জনক প্রভাব। নির্দিষ্ট মাত্রার চারগুণ বেশি ওষুধ ব্যবহার করেও বমি হওয়া, চুল ওঠা, রক্ত পড়া প্রভৃতি ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। অস্ত্রোপচার ছাড়াই ক্যান্সারের সুচিকিৎসা করার জন্য অ্যানজিওস্ট্যাটিন ও এনডোস্ট্যাটিন অব্যর্থ। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ফোকম্যান বলেছেন, "আপনার যদি প্রাণঘাতী ক্যান্সার হয়ে থাকে এবং আপনি যদি ইঁদুর হন, তবে আপনার ভাল যত্ন আমরা নিতে পারব।" নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ডে স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরির নোবেল পুরস্কারজয়ী জীববিজ্ঞানী জেম্‌স ওয়াটসন মনে করেন, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে চার্লস ডারউইনের মতোই জুডা ফোকম্যান এক যুগান্তকারী গবেষক হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হোক। ফোকম্যান নির্মূল করুন মানুষের কর্কট রোগ।

জাপানে বসছে বিশ্ব সংবাদপত্র কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন

আর কয়েকদিন পরেই ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত জাপানের কোবে শহরে বসছে বিশ্ব সংবাদপত্র কংগ্রেসের ৫১তম বার্ষিক সম্মেলন। সেজন্য এখন এই শহরটিকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে নতুনভাবে।

লিখেছেন **অশোক সেনগুপ্ত**

সংবাদপত্র জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক এবার বসছে জাপানে। এটি বিশ্ব সংবাদপত্র কংগ্রেসের ৫১তম বার্ষিক সম্মেলন। এই সঙ্গে, অর্থাৎ ৩১ মে থেকে ৩ জুন পর্যন্ত উদ্যোক্তারা একই জায়গায় আয়োজন করেছেন সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী গোষ্ঠীর 'ইন সার্চ অব এক্সেলেন্স'। ১৯৯৭ সালে ৭২টি দেশের ৯৮০ জন প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন আমস্টারডামে সংবাদপত্র কংগ্রেসের ৫০তম বার্ষিক সম্মেলনে। কংগ্রেসের ৪৯তম বার্ষিক সম্মেলনটি হয়েছিল ওয়াশিংটন ডি সি-তে। ওই বছর থেকে সম্মেলনে শুরু হয় 'ভিশন অব দ্য ফিউচার' নামে আলাদা একটি আলোচনাচক্র, একই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে। সংবাদপত্রের প্রকাশনা, মুদ্রণ পদ্ধতি, আঙ্গিক, সব কিছুই দ্রুত বদলে যাচ্ছে। সেই অর্থে দেশবিদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের নীতি-নির্ধারক ও পরিচালকদের পারস্পরিক আলোচনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও বাড়ছে। প্রতি বছর তাই বিশ্ব সংবাদপত্র কংগ্রেসের মর্যাদাও বাড়ছে দ্রুত। জাপানের কোবে শহরে প্রস্তাবিত কংগ্রেসের মূল উদ্যোক্তা সে-দেশের সংবাদপত্রের প্রকাশক ও সম্পাদক সংগঠন এবং 'নিহন শিনবুন কিওকাই।' বছরকয়েক আগে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে শহরটির একটি বড় অংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন সেই শহরটিকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। মূল অনুষ্ঠানের আগে আয়োজকরা জাপানের প্রচারমাধ্যম সম্পর্কে কয়েকটি শিক্ষাসফরের ব্যবস্থা করছেন। এসবের জন্য প্রয়োজনীয় খরচের যে হিসেব উদ্যোক্তারা দিয়েছেন, তৃতীয় বিশ্বের বাসিন্দাদের কাছে তা বেশি মনে হতে পারে। 'পাপারাৎজি'দের নাছোড়বান্দা ব্যবহার এড়াতে গিয়ে যেভাবে ব্রিটেনের যুবরানি ডায়ানা এবং তাঁর বন্ধু ডোডি মারা গেলেন, তা নিয়ে বিশ্ব জুড়ে বিতর্ক হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে নানা মহলে, ভি আই পি-দের ব্যক্তিগত জীবনে সত্যিই সাংবাদিক ও আলোকচিত্রীরা এইভাবে হানা দিতে পারেন কি না। কোবের আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে এ-বিষয়ে একটি পৃথক আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর শিরোনাম, 'প্রাইভেসি ল'স : নাইসটি অর নেসেসিটি'। প্যারিসের বিশ্ব সংবাদপত্র সংগঠনের মহাপরিচালক টিমোথি বাল্ডিং, ব্রিটেনের 'দ্য গার্ডিয়ান'এর রয় গ্রিনস্লেড, ফ্রান্সের 'লিবারেশন'এর সার্গ য়ুলি, চলতি বছরে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জাপানের 'আশাহি শিমবুন'এর পরিচালনমণ্ডলীর সদস্য ইওশিও মুরাকামির মতো নামী ব্যক্তিত্বরা অংশ নেবেন ওই আলোচনায়। সংবাদপত্র জগতে প্রযুক্তির প্রয়োগ কতখানি এবং কোন পর্যায়ে হওয়া উচিত, তা নিয়ে ভাববিনিময় করবেন দেশ-বিদেশের সংবাদপত্র-প্রশাসকরা। থাকবে বিজ্ঞাপনদাতাদের কীভাবে আগ্রহ ও আকর্ষণ বাড়ানো যায়, তার কৌশল নিয়ে আলোচনাও। ব্রিটেনের 'দ্য টাইমস'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডগলাস ফিন, ভারতের 'মলয়ালম মনোরমা'র এগজিকিউটিভ এডিটর জ্যাকব ম্যাথু, জাপানের 'ইওমিউরি শিমবুন'এর চেয়ারম্যান কেনিয়া মিজুকামি, জার্মানির 'বার্লিনার ৎসাইটুঙ'-এর প্রধান সম্পাদক মিশায়েল মায়ার, ব্রিটেনের 'দ্য সানডে টাইমস'-এর মধ্যপ্রাচ্য সংবাদদাতা মারি কোলভিন প্রমুখ হাজির থাকবেন নানা আলোচনায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেনটাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব জার্নালিজমের পরিচালক বুক রায়ান, 'পিউ সেন্টার ফর সিভিক জার্নালিজম'-এর এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর য়ান শেফার, 'নিউ মিডিয়া ডিজাইন ইন্টারন্যাশনাল'-এর প্রেসিডেন্ট মারিও গার্সিয়া, 'আমেরিকান প্রেস ইনস্টিটিউট নিউ মিডিয়া সেন্টার'-এর পরিচালক ক্রিশ ফেওলার-এর মতো প্রশাসক-অধ্যাপকরাও থাকবেন কোবের বিভিন্ন আলোচনাচক্রে।

আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে থাকছে প্রমোদ বা শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থাও। ১,২০০ বছরেরও আগে এক জাপ সম্রাট তাঁর রাজধানী নগরী হিসেবে তৈরি করেছিলেন কিয়োটো শহর।

সেখানকার সুদৃশ্য 'শোগুন উদ্যান' (চতুর্দশ-ষোড়শ শতকে তৈরি), গোল্ডেন প্যাভিলিয়ন, জাপানের সর্ববৃহৎ কাঠের কাঠামো 'সানজু সাঙ্গেন্ডো' সহ আকর্ষক দ্রষ্টব্যগুলি দেখানো হবে বিশ্ব সংবাদপত্র কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের। বিখ্যাত ফুজি পাহাড় তাঁরা দেখবেন সংলগ্ন জাতীয় পার্ক থেকে। টোকিয়ো হোক্কাইডো সহ বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হবে কখনও বিলাসবহুল বাসে, কখনও বুলেট ট্রেনে। উদ্যোক্তারা বিদেশি অতিথিদের দেখাবার তালিকায় একদিকে যেমন রেখেছেন 'ইউনেস্কো'র বিশ্ব ঐতিহ্যের স্থান হিসেবে স্বীকৃত ৪০০ বছরের পুরনো 'হিমেজি' দুর্গ, তেমনই আছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ঝুলন্ত সেতু 'আকাশি কাইকিও'। ওই সেতুর ওপরে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের জন্য হবে সংক্ষিপ্ত জাপানি পুতুলনাচ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ডায়মণ্ড কমিকস ধমাকা

ডায়মণ্ড কমিকস
ভারতে সর্বাধিক বিক্রীত কমিকস

1 প্রথম পুরস্কার

2 দ্বিতীয় পুরস্কার

1 রঙ্গীন টেলিভিশন

3 তৃতীয় পুরস্কার

1 টু-ইন্-ওয়ান

সবান্তনা পুরস্কার

100 টাইটান ঘড়ি

ডায়মণ্ড কমিকসের সদস্য হোন

জিতুন আকর্ষক পুরস্কার + অসংখ্য আকর্ষক উপহার ফ্রী

এক বছরের সদস্যতা শুল্ক			
12 মাস পর্যন্ত নতুন ডায়মণ্ড কমিকসের সেট মূল্য প্রতি সেট 60 টাকা	=	টা.	720/-
আপনার জন্য 1) পাকার্ পেন		টা.	120/-
ফ্রী উপহার 2) জনপ্রিয় ডায়মণ্ড কমিকস		টা.	60/-
3) জনপ্রিয় অমর চিত্রকথা		টা.	60/-
4) ডাক খরচ		টা.	180/-
আর আপনি পাবেন (টা. 720/--র কমিকস + টা. 420/--র ফ্রী উপহার)		টা.	1140/-
আপনি দেবেন ঃ টা. 720/-			

দুই বছরের সদস্যতা শুল্ক			
24 মাস পর্যন্ত নতুন ডায়মণ্ড কমিকসের সেট মূল্য প্রতি সেট 60 টাকা	=	টা.	1440/-
আপনার জন্য 1) পাকার্ পেন		টা.	120/-
ফ্রী উপহার 2) জনপ্রিয় ডায়মণ্ড কমিকস		টা.	200/-
3) জনপ্রিয় অমর চিত্রকথা		টা.	200/-
4) ডাক খরচ		টা.	360/-
আর আপনি পাবেন (টা. 1440/--র কমিকস + টা. 880/--র ফ্রী উপহার)		টা.	2320/-
আপনি দেবেন ঃ টা. 1440/-			

তিন বছরের সদস্যতা শুল্ক			
36 মাস পর্যন্ত নতুন ডায়মণ্ড কমিকসের সেট মূল্য প্রতি সেট 60 টাকা	=	টা.	2160/-
আপনার জন্য 1) পাকার্ পেন		টা.	240/-
ফ্রী উপহার 2) জনপ্রিয় ডায়মণ্ড কমিকস		টা.	400/-
3) জনপ্রিয় অমর চিত্রকথা		টা.	400/-
4) ডাক খরচ		টা.	540/-
আর আপনি পাবেন (টা. 2160/--র কমিকস + টা. 1580/--র ফ্রী উপহার)		টা.	3740/-
আপনি দেবেন ঃ টা. 2160/-			

ফ্রী উপহার হিসেবে নিজের মনের মত 'জনপ্রিয় ডায়মণ্ড কমিকস' এবং 'জনপ্রিয় অমর চিত্রকথা' বেছে নেবার জন্য এপ্রিল, মে এবং জুন '98-র ডায়মণ্ড কমিকসে প্রকাশিত সূচী দেখুন!

মে 1998-এ প্রকাশিত ডায়মণ্ড কমিকস

চাচা চৌধুরী আর আজকের রবিনহুড
মোটু-পাতলু আর দুই চোর
পিঙ্কী ডাইজেস্ট-9
রমন-গপ্পু আর পান
অগ্নিপুত্র-অভয় আর সাইবোর্গ
শক্তিমান-2
ফ্যান্টম-80
সুপারম্যান-3
সুপারম্যান-4
ব্যাটম্যান-3
ব্যাটম্যান-4

তাড়াতাড়ি করুন! ফ্রী উপহার পাবার জন্য নিজের সদস্যতা শুল্ক আজই পাঠান।

আমি নতুন ডায়মণ্ড কমিকস সেট পাবার জন্য সদস্য / সদস্যা হতে চাই (✓)
☐ 1 বছর (12 x টা.60/-) মোট টা.720/- + টা.420/--র ফ্রী উপহার
☐ 2 বছর (24 x টা.60/-) মোট টা.1440/- + টা.880/--র ফ্রী উপহার
☐ 3 বছর (36 x টা.60/-) মোট টা.2160/- + টা.1580/--র ফ্রী উপহার

আমার সদস্যতা শুল্ক টা.720/- ☐ টা.1440/- ☐ টা.2160/- ☐
চেক / ডি.ডি. নং .....দিন.....ডায়মণ্ড কমিকস (প্রা.) লিমিটেডের নামে, যা দিল্লী / নয়ডা-তে দেয়, সংলগ্ন করে পাঠাচ্ছি!
(দিল্লীর বাইরের সদস্য / সদস্যা শুধুমাত্র ডিমাণ্ড ড্রাফ্ট (ডি.ডি.) পাঠান)

নাম ঃ শ্রী / শ্রীমতি / কুমারী _____ জন্ম তিথি ☐☐ ☐☐ ☐☐

ঠিকানা _____

_____ পিন ☐☐☐☐☐☐

ফোন ঃ _____ দিন _____ হস্তাক্ষর _____

নিয়ম এবং শর্ত ঃ ●এই উপহার যোজনার অন্তিম তিথি 30-শে জুন, 1998! প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং সান্ত্বনা পুরস্কারের ঘোষনা 30-শে জুন, 1998-এর পরে করা হবে। প্রথম পুরস্কারে ডিজনীল্যাণ্ড যাবার জন্য একটি টিকিট। ●পুরস্কারের ব্যাপারে কোন রকম পত্র-বিনিময় স্বীকার্য হবে না, কিারকদের সিদ্ধান্তই অন্তিম নির্ণয় হবে। ●শুল্ক পাবার 3-4 সপ্তাহ পরে কমিকস সেট এবং 6-8 সপ্তাহ পরে ফ্রী উপহার ক্যারিয়ার / রেজি. ডাক দ্বারা পাঠানো হবে। ●দিল্লীর বাইরের সদস্য / সদস্যরা শুল্ক শুধুমাত্র ডিমাণ্ড ড্রাফ্ট দ্বারাই পাঠান। ●এই যোজনার অন্তর্গত সদস্যরাই একমাত্র পুরস্কারের জন্য হওয়া লটারীতে অংশ নিতে পারবেন। ডায়মণ্ড কমিকসের কর্মচারী বা ওনাদের আত্মীয়-স্বজনরা এই যোজনার অন্তর্গত সদস্য হতে পারবেন না। ●পুরস্কার বিজেতাদের ব্যক্তিগত ভাবে জানানো হবে। ●পুরস্কারের বদলে নগদ টাকা দেওয়া হবে না। ●ডায়মণ্ড কমিকস (প্রাঃ) লি.-র কাছে কোনরকম অন্তিম নোটিশ না দিয়ে বা কোনরকম কারণ না দর্শিয়ে এই যোজনার অন্তিম তিথি বাড়াবার বা বাতিল করে দেবার সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে। ●এই প্রস্তাব কেবলমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের জন্যই স্বীকার্য হবে। সকল প্রকার বিবাদের জন্য ন্যায়িক ক্ষেত্রাধিকার, দিল্লী হবে।

কূপন ভরুন আর বেছে নেওয়া **'জনপ্রিয় ডায়মণ্ড কমিকস'** এবং **'জনপ্রিয় অমর চিত্রকথা'**-র সূচী নিজের সদস্যতা শুল্কের সঙ্গে নীচের ঠিকানায় পাঠান ঃ

ডায়মণ্ড কমিকস (প্রা.) লি., A-11, সেক্টর-58 নয়ডা-201 301 (উ.প্র.)

অ্যাসটেরিক্স

দুই প্রধানে ধুন্ধুমার

গল্প : গোসিনি
ছবি : ইউদেরজো

পরের পাতায় শুরু হল অ্যাসটেরিক্সের নতুন গল্প : ব্রিটেনে অ্যাসটেরিক্স

অ্যাসটেরিক্সের অভিযান

ব্রিটেনে অ্যাসটেরিক্স

গল্প : গোসিনি
ছবি : ইউদেরজো

যিশুর জন্মের ৫০ বছর আগে। সমস্ত গল দেশ রোমের অধীনে...ঠিক সবটা নয়, এক ছোট্ট গ্রাম এখনও অদম্য। সেই গ্রামের বীর বাসিন্দারা এখনও ঠেকিয়ে রেখেছে বিদেশি আক্রমণকারীদের। গ্রামের কাছাকাছি চারটি রোমান সেনাশিবির : পেতিবোনাম, বাবাওরাম, অ্যাকোয়েরিয়াম ও লোডানাম। শিবির চারটিতে যে রোমান সেনারা বাস করে, তাদের জীবন খুব একটা শান্তিপূর্ণ নয়...

গলের কয়েকজন অধিবাসী

অ্যাসটেরিক্স, এই রোমাঞ্চকর গল্পগুলির নায়ক। এই ছোটখাটো যোদ্ধার যেমন বুদ্ধি, তেমনই সাহস। বিপজ্জনক সব কাজের দায়িত্বই ওকে নির্দ্বিধায় দেওয়া যায়। অ্যাসটেরিক্সের আছে অতিমানবিক শক্তি, যার উৎস পুরোহিত এটাসেটামিক্সের জাদু-পানীয়ের পাত্র...

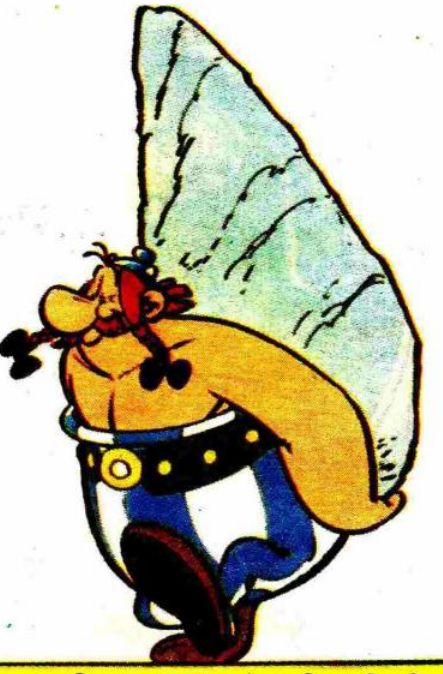

ওবেলিক্স, অ্যাসটেরিক্সের প্রাণের বন্ধু। 'মেনহির' নামে এক ধরনের স্মারকশিলা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া এর পেশা, বুনো শুয়োরের 'রোস্ট' খাওয়া এর নেশা। যে কোনও সময় সব কাজ ফেলে ওবেলিক্স বেরোতে পারে বন্ধুর সঙ্গে নতুন অভিযানে, শুধু চাই বুনো শুয়োরের রোস্ট ও শত্রুকে উত্তমমধ্যম দেওয়ার সুযোগ...

এটাসেটামিক্স। গ্রামের খুব মান্য পুরোহিত। গাছগাছড়া থেকে তৈরি করেন নানারকম পানীয়। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তাঁর নিজস্ব এক জাদু-শরবত। গলায় ঢাললে শরীরে আসে অতিমানবিক শক্তি। এ ছাড়াও এটাসেটামিক্স জানেন নানা রকম গোপন কৌশল....

এবং বিশালাকৃতিক্স। গ্রামের মহামান্য প্রধান। রাজসিক, সাহসী, রগ চটা ও অভিজ্ঞ যোদ্ধা। 'প্রজারা যেমন শ্রদ্ধা করে, শত্রুরা তেমনই ভয় করে। এঁর একটাই ভয়, আগামীকাল মাথায় না আকাশ ভেঙে পড়ে....তবে নিজেই আবার বলেন, 'আগামীকাল কখনও আসে না।'

কলরবিক্স। চারণকবি। এঁর সঙ্গীতপ্রতিভা সম্বন্ধে নানাজনের নানা মত। এঁর নিজের বিশ্বাস, ইনি অসামান্য প্রতিভাবান। অন্যেরা ভাবে ঠিক উলটো। অবশ্য গান টান না গাইলে, কিংবা মুখ না খুললে এঁর মত বন্ধু কমই আছে...

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

আর্চি
ইস, তোমার মাথাটা বড় বিশ্রী লাগছে রেগি।
আঁচড়ানোর পর এবার ঠিক তো!
এখানে দাঁড়াও। একটা কাজ সেরে আসছি।
ছবি প্রিন্ট ও কপি
নিজের ছবির কপি করাবে বুঝি?
হ্যাঁ, করিয়ে রাখি। অনেকেই তো চাইবে।
অ্যাঁ! এত?
নয় কেন? আমি সুদর্শন... সুবেশী... ভাল খেলোয়াড়...
খচাক
খচাক
চতুর...বুদ্ধিমান...রোমান্টিক... রসিক...
আসলটা নিতেই ভুলে গেছেন।
ও হ্যাঁ!
আমার একটা নিজস্বতা আছে... ভাল কথা বলতে পারি...
?
8-18

হাসির গল্প

হুঁকোডাইল

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

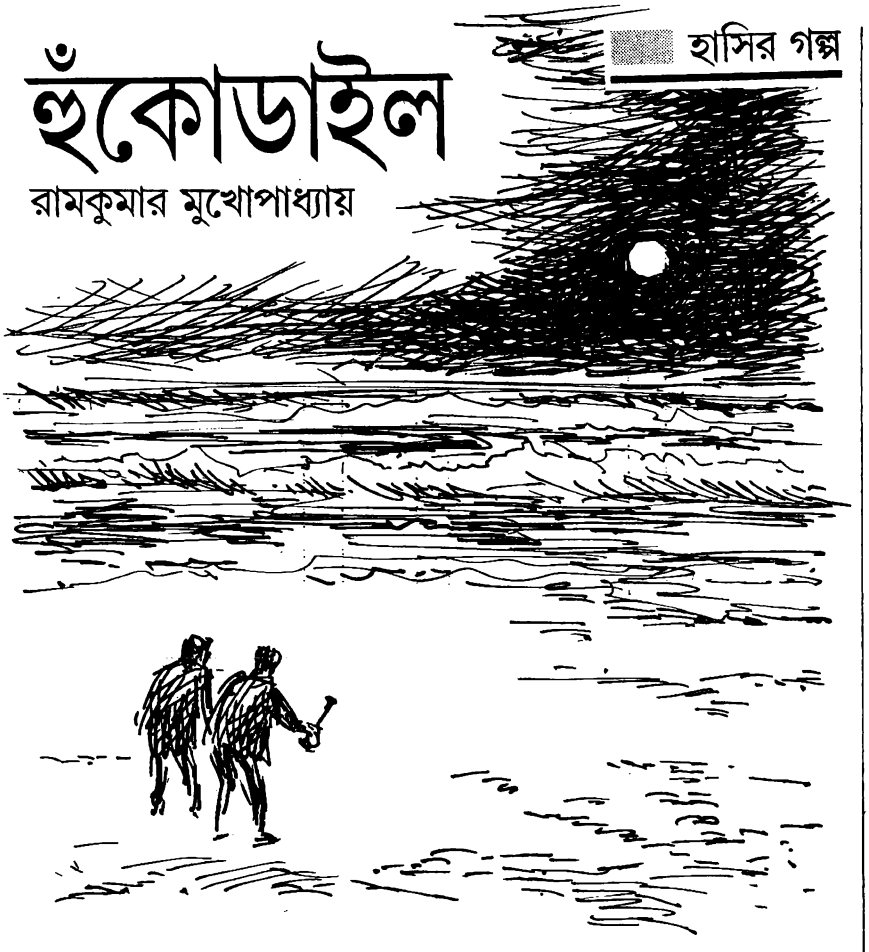

আর্মচেয়ার-এ বসে শব্দের একটা জট ছাড়াচ্ছিলুম। ইংরেজি 'আর্মচেয়ার' শব্দটা বাংলায় 'আরাম চেয়ার' হয়েছে। আমাদের আমলের দু-চারজন 'আরাম কেদারা' বলে। ভাবতে অবাক লাগে, ইংরেজি ভাষার 'হাত' বাংলা অনুবাদে 'আরাম' হয়ে গেল। কিন্তু সমস্যাটা ঠিক তা নয়। নিজের কেদারার নাম যে যার ইচ্ছেমতো দিতেই পারে। জটিলতা অন্য জায়গায়। একজন বলেছেন, 'আরাম হারাম হ্যায়'। প্রশ্নটা হল, যদি আরাম মানে হারাম হয়, তা হলে আরাম চেয়ারকে 'হারাম চেয়ার' বলা হবে কি না।

ভাবনার মাঝে চেরি এসে হাজির। আমি যেন হাতে চাঁদ পেলুম। ইংরেজি এবং বাংলা দুটো ভাষাতেই চেরি ভীষণ দক্ষ। সে প্রথম বাংলা শেখে ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগনার গির্জার নেতা মনোএল-দা-আস্‌সুম্পসাঁউ-এর কাছে। সে-সময়ের বইয়ের পাঠ্যবস্তু এখনও মুখস্থ। এক নিশ্বাসে বলে যাবে :

সেভিল্যা শুহরে এক গৃহস্থ আছিল, তার নাম সিরিলো ; সেই সিরিলো কেবল এক পুত্রো জমাইল ; তাহারে এত দয়া করিল যে- কোনও দিন তাহারে শিক্ষাও না দিল এবং শাস্তিও না দিল ; সে যাহা করিতে চাহিত, তাহা করিত।

উইলিয়ম চেরির পড়াশোনা নিয়ে বলতে গেলে থই মিলবে না। গড় উইলিয়ম মহাবিদ্যালয় থেকে বই বের হওয়া মাত্র একটি উইলিয়ম কেরি পেল তো অন্যটি উইলিয়ম চেরি। গোলোকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ', তারিণীচরণ মিত্রের 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট', রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং', চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস'— এমন কত বই তার পড়া।

কিন্তু চেরির মতো ইন্টারন্যাশনাল লাইব্রেরিও আমার প্রশ্নে থমকে গেল। পরচুলোর ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বলল, "রামকুমার, ভাষার চুলচেরা বিচারে তোমার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়া ওঠা কঠিন। "

আমি বললুম, "কেন ? হারাম চেয়ারে অসুবিধে কোথায় ?"

চেরি অসম্মতি প্রকাশ করে বলল, "এইরূপে অযাচিত শব্দদূষণে আক্রান্ত হইবে। "

আমি চেরির মত মানতে পারি না। বললুম, "ধ্বনি-সাম্যের ফলে কত শব্দই তো বদলে গেল। ধরো, তোমার ইংরেজি 'হসপিটাল' হয়ে গেল 'হাসপাতাল'। সংস্কৃত 'বিস্ফোটক' হল 'বিষফোড়া' কোথাকার 'বিষ'-এর প্রভাবে।

হাসল চেরি। হাঁকানুকির ছাতুর দেওয়া হুঁকোটাতে বারকয়ের টান দিয়ে বলল, "তুমি কে ?"

আমি অবাক ! "এ-কথার মানে ?"

চেরি বলল, "তুমি শ্রীমৎ রামকুমার শর্মা। তুমি লোক নও। "

"স্ত্রীলোক ?"

"না, না। ব্যক্তি। ভাষাতত্ত্বের যে নিয়মে 'আর্মচেয়ার', 'হসপিটাল', 'বিস্ফোটক' বদল হইয়া থাকে তাহাকে বলে 'ফোক এটিমলজি'। বাংলায় যার নাম 'লোকনিরুক্তি'। একজন ব্যক্তির ইচ্ছেয় আরাম চেয়ারকে হারাম চেয়ার করা যাইবে না। "

আমি আকাশ থেকে, উড়োজাহাজের জানলা গলে, নীচে পড়লুম। অবাক হয়ে চেরিকে বললুম, "সারা বঙ্গদেশের মানুষ আর্মচেয়ার ব্যবহার করত নাকি ? গাঁয়ে গাঁয়ে লোকের ঘরে দোরে পাতা থাকত চেয়ার ? কীর্তন, বাউলকে লোকসংস্কৃতি বলা হয়, কিন্তু আর্মচেয়ার শব্দটা কেমন করে আরাম চেয়ার হবে লোকনিরুক্তিতে ?"

চেরি হুঁকো নামিয়ে বলল, "ভাবিবার কথা। এক্ষেত্রে 'লোক' শব্দটি ঠিক প্রয়োগ হইবে না। বরং 'গণ' কথাটি উপযুক্ত। 'হাসপাতাল' শব্দটি লোকনিরুক্তি ঠিকই, কিন্তু আরামচেয়ার গণ-নিরুক্তি বলা ভাল। "

চেরিকে পথে এনে আমার প্রশ্নটি আবার তুললুম, "তা হলে আমার 'হারাম চেয়ার' ?"

চেরি বলল, "বিজ্ঞানে নতুন আবিষ্কারকে আবিষ্কারকের নাম অনুসারে উল্লেখের রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। তোমার আবিষ্কারের ক্ষেত্রে 'লোক' কিংবা 'গণ' না লইয়া তুমি আপন নাম দাও। "

এত ভাল একটা সমাধান খুঁজে পেয়ে চেরি পরচুলার পাকাচুল তুলতে লাগল।

ওদিকে আমি অথই জলে। 'আরাম' এবং 'হারাম' দুটোর ভেতরেই তো 'রামকুমার'-এর 'রাম' ঢুকে আছে।

আমার কথা শুনে হাল ছেড়ে দিল চেরি। আমাদের নৌকো মাঝ দরিয়ায় পাক খেতে লাগল ঘূর্ণিতে। হঠাৎ 'ইউরেকা' বলে চেঁচিয়ে উঠল চেরি। সমাধান আছে। হুঁকোমুখো জানে।

সত্যি তো ! হুঁকোমুখো কত কিছু জোড় লাগাতে শিখেছিল। আফিঙের থানাদার

শ্যামাদাসের এই ভাগ্নেটি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। সারাটা দিন সে গাইত 'সারে গামা টিমটিম'। সেই 'টিমটিম' ঘামত না যতক্ষণ না আকাশের বৃষ্টি 'ঝিমঝিম' শব্দে গানে অন্ত্যমিল আনত। রায়মশাই, আমাদের সুকুমারবাবু, ওকে দেখে তো অবাক। এক জোড়া হনুমানের দু'খানি লেজ হুঁকোমুখো এমন জোড়-কলম করেছিল যে, নন্দনকানন থেকে মৎস্যকন্যারা দেখতে এসেছিল।

কিন্তু হুঁকোমুখো একদিন অদৃশ্য হয়ে গেল। কোথায় গেল কেউ জানে না। কথা রটেছিল বল্মীক হয়ে গেছে। সেই শুনে আমরা কত উইঢিপি ভাঙলুম। কোথাও নেই হুঁকোমুখো। কেউ বলল দু' লেজের মাঝ দিয়ে মাছিগুলো ঢুকে বড় জ্বালাতন করছিল হুঁকোমুখোকে। রেগে সে চলে গেছে এমন দেশে যেখানে মাছি নেই। অন্য একটি কাহিনীও প্রচলিত আছে। একদিন রাতে গড়ের মাঠের ভেতর দিয়ে হুঁকোমুখো হেঁটে চলেছিল। তার ঠিক সামনে চলছিল একটা লাঠি। সেই চলন্ত লাঠিটাকে ধরতে গিয়েই নাকি সে হারিয়ে গেল। এই শেষ কথাটাতে চেরি বিশ্বাস করে। নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে হুঁকোমুখো ভাষা-ব্যাকরণ চর্চা করছিল। একদিন জানতে চেয়েছিল 'ওয়াকিং' আর 'স্টিক'-এর মাঝে হাইফেন হবে কি না। কে জানে হুঁকোর সেই ব্যাকরণের লাঠিটা ওকে নিশিডাক দিল কি না !

আমরা ঠিক করলুম হুঁকোমুখোকে খুঁজে বার করতে হবে। কবে ? খুঁজতে শুরু করা হবে কোন তারিখ থেকে ?

চেরি বলল, "অদ্যকাল হইতেই। আগামী মে মাসে হুঁকোর ২.১তম জন্মদিন। তাহার পূর্বেই ওকে ফিরিয়ে আনিতে হইবে। "

অঙ্ক বিষয়টা আমার মাথায় ঠিক খেলে না। দর্শন চর্চা করি বলে দ্বৈত আর অদ্বৈত জায়গা বদল করে নেয়। এক আর দুই গুলিয়ে যায়। ভেবেছিলুম হুঁকোমুখোর বয়েস একশো কুড়ি হবে আগামী মে মাসে। আসলে দুশো দশ।

গড়ের মাঠে পৌঁছে আমরা হুঁকোমুখোর পদাঙ্কের সন্ধান করতে লাগলুম। অসুবিধে হল না। ওর ভারী পায়ের ছাপ মাটির অনেকখানা গভীরে এখনও চিহ্ন রেখে গেছে। খোঁজার বাড়তি সুবিধে হল, হুঁকোর লাঠিটার পদচিহ্নও হুঁকোর আগে আগে আঁকা থেকে গেছে। চলতে-চলতে বেহালাতে ঢুকে গেলুম। 'ময়মনসিংহ গীতিকা' খ্যাত দীনেশচন্দ্র সেনের বাড়ির কাছে সামান্য থামলুম। হুঁকোমুখো মাঝে-মাঝেই 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'জয়চন্দ্র', 'চন্দ্রাবতী', 'কমলা', 'কঙ্ক', 'লীলা', 'মদিনা', 'কেনারাম' ইত্যাদি নামধাম বলত। ভেলুয়া সুন্দরীর কথা কতবার তার মুখে শুনেছি। ভাবলুম জিজ্ঞেস করে দেখি। দু'পা এগিয়ে চোখে পড়ল লাঠিটা একবার দরজার কাছে পাক দিয়ে দক্ষিণের পথে চলে গেছে। আমরাও এগোতে লাগলুম। বড়িশার চণ্ডীমণ্ডপে মাথা ঠেকিয়েছে হুঁকো। সেই মুণ্ডাঙ্ক চোখে পড়ল। এগোতে এগোতে হিরা বন্দরে। ওখান থেকে চলতে চলতে হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদী। নদী পেরিয়ে সন্ধের মুখে বকখালিতে। বক কই— এ যে সব পর্যটক !

চাঁদ উঠেছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় চাঁদের আলো দোল খাচ্ছে। হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি 'ঝিমঝিম' শব্দ। চেরি বলল, "পরি সকল নৃত্য করিতেছে। নূপুর বাজিতেছে। "

সেই নূপুরের তালে তালে সমুদ্রের ওপর থেকে সুর ভেসে এল. "সারে গামা টিমটিম। "

আমরা চিৎকার করে উঠলুম, "হুঁকোমুখো। "

উত্তাল তরঙ্গ শুরু হল সমুদ্রের বুকে। খানিক পরে তাকিয়ে দেখি জলের ওপর কী একটা ভাসছে। চেরি চিৎকার করে উঠল "ক্রোকোডাইল। "

সমুদ্রের ভেতর থেকে প্রতিবাদ শোনা গেল, "হুঁকোডাইল। " তাকিয়ে দেখি সত্যিই তাই। মাথা থেকে বুক অবধি হুঁকোমুখো আর বাকি অংশ ক্রোকোডাইল।

বালিয়াড়িতে উঠে এল হুঁকোডাইল। তারপর হুঁকো শোনাল তার বৃত্তান্ত।

'ওয়াকিং' আর 'টেবিল'-এর মাঝের হাইফেনটা দিতে ভুলে গিয়েছিল হুঁকো। হঠাৎ মাঝরাতে লাঠিটা চলতে শুরু করল। ওকে ধরতে গিয়েই সমুদ্র পর্যন্ত এসে গেল হুঁকো। জলে নামতেই ধরল কুমিরটা। কুমিরটা হুঁকোকে গিলতে থাকে। হুঁকো চিবোয় কুমিরের মাথাটা। শেষে হুঁকোর অর্ধেক আর কুমিরের অর্ধেক জোড়কলম হয়ে গেল।

অনেক সুখ-দুঃখের কথা হল। হাঁকানুকিতে ছাতুর নারকেল সভ্যতা গড়ার কথা বললুম। সে কথা শুনে নারকেলডাঙাতে আমাদের নারকেল খাওয়ার কথা উঠল। উলটি-ডিঙিতে খালের জলে মাছ ধরার পুরনো গল্প হল।

হুঁকোকে বললুম, "চ ভাই। ফিরে চ'। তোকে ভিক্টোরিয়ার লেক-এ কিংবা রবীন্দ্র সরোবরে ছেড়ে রাখব। "

চেরি বলল, "জোয়ার-ভাটার প্রয়োজন হলে গঙ্গাতে ছাড়িয়া রাখিতে পারি। গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান চলিতেছে। গঙ্গানদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পাইবে। "

হুঁকো বলল, "এই বেশ আছি। মাছিদের ঝামেলা নেই। তা ছাড়া এদেশ-সেদেশ চলে যাচ্ছি নিজের ইচ্ছেয়। ভিসা-পাশপোর্টের দরকার নেই। নিত্যদিন সমুদ্র-স্নান হচ্ছে। ডাঙার মানুষ পৃথিবীর একভাগ ভোগ করে। আমার অধিকারে পৃথিবীর তিনভাগ। "

চেরি সমর্থন জানিয়ে বলল, "জলের অপর নাম জীবন। টেনিসন 'দ্য পাসিং অব আর্থার'-এ বলিয়াছিলেন মহান গভীরতা থেকে মহান গভীরতায় সে চলে। সেই মহান গভীরতা হইল...। "

আমি বললুম, "লাঠিটার কী হল ?"

হুঁকো বলল, "সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলে গেল। "

"কোথায় ?"

"ইউরোপের দিকে। "

চেরি বলল, "দেখেছি, দেখেছি। "

আমি ঘাড় ফেরালুম। হুঁকো লেজ নাড়ল।

চেরি জিজ্ঞেস করল, "লাঠিটার মাথাটা বঙ্কিম তো ?"

হুঁকো বলল, "হ্যাঁ। "

চেরি জিজ্ঞেস করল, "বেশ চকচকে উজ্জ্বল তো ?"

হুঁকো বলল, "তাই। "

চেরি প্রশ্ন করল, "লম্বায় কোমর পর্যন্ত বিস্তৃত তো ?"

হুঁকো বলল, "ঠিক। "

চেরি বলল, "প্রাচ্যের লাঠি পাশ্চাত্যে চলিয়া গেল। দ্য ইস্ট গোজ টু দ্য ওয়েস্ট। দ্য টোয়েন মাস্ট মিট। "

আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম, "কিন্তু লাঠি কোথায় ?"

চেরি ঠাণ্ডা গলায় বলল, "চার্লি চ্যাপলিনের হাতে। "

"লাঠি তো মিলল কিন্তু আমার আরাম নাকি হারাম চেয়ার ?

হুঁকো বাংলা ও ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণ নিয়ে কাজ করছিল। নিজের শরীর দিয়ে সে শব্দের জোড়-কলম তৈরি করল। সে ছাড়া কে উত্তর দেবে আমার প্রশ্নের ?

হুঁকো বলল, "'আ'ও বাদ, 'হ্য'ও বাদ। শুধুই রাম। রাম মানে বৃহৎ। সমস্ত কেদারার মধ্যে বৃহৎ আর্মচেয়ার কাজেই রাম-কেদারাই ভাল।

হুঁকো জলের নীচে চলে গেল। আমরা ফিরলুম কলকাতায়। এবার একদিন হাঁকানুকিতে ছাতুর কাছে যাওয়া দরকার। তার মহানগরীতে হুঁকোডাইলের একটা পৃথক ব্যবস্থা রাখার কথা বলতে হবে।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

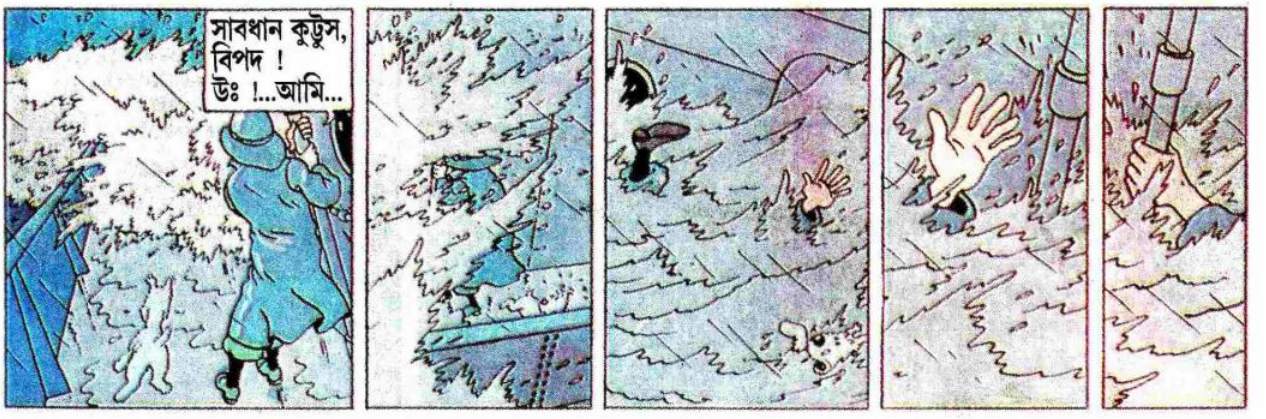
সাবধান কুট্টুস, বিপদ !
উঃ !...আমি...

আমি ভেবেছিলাম ভেসে গেছি। কিন্তু কুট্টুস ? কুট্টুস কোথায় ?
কুট্টুস !
কুট্টুস !!...

মারা যাচ্ছিলাম, কুট্টুস ! কী সাঙ্ঘাতিক ঝড় !
ও, তুমি ! চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে, তাই না ?
কী ? চমৎকার হাওয়া ? এটা ঝড়বৃষ্টি নয় ?
ঝড়বৃষ্টি ? বাঃ, কী কথাই না বললে। শুকনো বাতাস। ব্যস।

তা হলে আর বিপদ নেই ?
না। তবু সাবধানে থাকবে। কিছু দেখা যাচ্ছে না...আর এখন সমুদ্রের যে জায়গাটা দিয়ে যাচ্ছি সেখানে জাহাজ চলে বেশি।
বহু জাহাজ এদিকে যাতায়াত করে। তবে ধাক্কা লাগার আশঙ্কা খুব কম। সব জাহাজেরই সামনেটা দেখার আলো আছে।
বাঁচাও !
গর্জনশীল টাইফুন !

কপিরাইট : কাস্টারম্যান এস.এ.

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গল্পও করা যাবে কম্পিউটারের সঙ্গে

আধুনিক সভ্যতার এক বড় বিস্ময় কম্পিউটার। মানুষের কথা শোনা, বোঝা ও উত্তর দেওয়া এখন কম্পিউটারের কাছে কোনও কঠিন কাজ নয়। লিখেছেন ঈশানী দত্ত রায়

কম্পিউটারের 'কি' টিপতে হবে না, 'মাউস' টেপারও দরকার নেই। শুধু মুখের কথাই যথেষ্ট। ব্যস, সামনে রাখা কম্পিউটার 'জবাব দেবে' আমাদের ভাষাতেই। চাইলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিব্যি গল্পটল্পও চলতে পারে কম্পিউটারের সঙ্গে। না, এটা কোনও 'ডিজিটাল' রূপকথা নয়। কম্পিউটারের মানুষের কথা শোনা, বোঝা ও উত্তর দেওয়া এখন দিনের আলোর মতোই সত্যি। শুধু তা-ই নয়, দেখা, শোনা, গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ, আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোনও গুণই আর অধরা নেই কম্পিউটারের কাছে।

মানুষের ভাষা বোঝা আর বলার ব্যাপারটাই ধরা যাক না কেন। তার আগে অবশ্য একটা বিষয় স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। কম্পিউটারের সঙ্গে আমাদের এখনকার যোগ লেখার মাধ্যমে। আমরা 'কি' টিপে বা মাউস 'ক্লিক' করে কোনও নির্দেশ লিখি বা সঙ্কেত দিই, কম্পিউটার তা নিজস্ব ভাষায় অনুবাদ করে নেয়। আর আমরা যখন কথা বলব, লিখিত সঙ্কেতের জায়গা নেবে আমাদের স্বর এবং সেই স্বর তখন কম্পিউটারের ভাষায় অনূদিত হবে। এই 'ভয়েস রেকগনিশন সফ্‌টওয়্যার'ই নতুন কম্পিউটারের মূল কথা।

এ-ও জেনে রাখা দরকার, মানুষের-ভাষা-বুঝতে-পারা যেসব 'প্যাকেজ' বিক্রি এবং তৈরি হচ্ছে, তার কোনওটিই সবজান্তা নয়। কোনওটি আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ, কোনওটি শিক্ষক, কোনওটি আবার বিমান-চলাচলের খবর দেয়। কারণ, শুধু একটি ভাষাতেই জীবনের সব ক্ষেত্র মিলিয়ে কয়েক লক্ষ কোটি শব্দের অর্থ (তাও আবার এক-একজনের উচ্চারণ এক-একরকম) বুঝতে কম্পিউটারকে আরও ক্ষমতাধর হতে হবে।

'ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির' (এম আই টি) ভিক্টর জু যেমন তাঁর 'কম্পিউটার-প্রোগ্রাম' 'জুপিটার'-এ আবহাওয়া-সংক্রান্ত দেড় হাজার শব্দ মজুত করেছেন। এই প্রোগ্রামে রয়েছে চারটি সফ্‌টওয়্যার প্যাকেজ। ধরা যাক, জুপিটারকে জিজ্ঞেস করা হল নিউ ইয়র্কের আবহাওয়া কেমন যাবে ? প্রথমে জুপিটারের ভয়েস রেকগনিশন প্রোগ্রাম প্রশ্নকর্তার স্বর বিশ্লেষণ করে শব্দগুলো কী, তা বের করল। দ্বিতীয় প্যাকেজের কাজ শব্দের অর্থ খুঁজে নেওয়া। অর্থাৎ প্রশ্নটি পুরোপুরি বোঝার পর এবার তৃতীয় প্যাকেজ ইন্টারনেট থেকে আবহাওয়ার ওই বিশেষ খবরটি জেনে নেবে। এবং শেষপর্যন্ত 'স্পিচ সিনথেসাইজার'-এর মাধ্যমে যান্ত্রিক স্বরে জবাবটি দিল প্রশ্নকর্তাকে। আগেই রেকর্ড করা নানা কথা থেকে দরকারমতো শব্দ কেটে-জুড়ে তৈরি হয় কম্পিউটারের যান্ত্রিক স্বর, ওই স্পিচ সিনথেসাইজারে। মানুষের ঠোঁট নাড়ার বিভিন্ন ধরন-ধারণকে কাজে লাগিয়েও এই স্বর যান্ত্রিকভাবে তৈরি করা যেতে পারে। কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও এরকম বেশ কয়েকটি ভয়েস্ রেকগনিশন প্যাকেজ বের করা হয়েছে। এর মধ্যে 'প্রজেক্ট লিসন'-এ কম্পিউটারের স্ক্রিনে গল্প ফুটে উঠবে, ছোটরা তা জোরে জোরে পড়বে, যেখানে তারা ঠেকে যাবে, শুধরে দেবে কম্পিউটার। আবার আর-একটি প্যাকেজে দোভাষীর কাজ করছে কম্পিউটার। দুই ভিনভাষী মানুষের কথা শুনে শুনে অনুবাদ করে দেবে চটপট।

কম্পিউটারকে মানুষের ভাষা শোনানো-বোঝানোর ব্যাপারে এগিয়েছেন ভারতের গবেষকরাও। 'টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ'-এর অধ্যাপক পি ভি এস রাও, অধ্যাপক অনিরুদ্ধ সেন, অধ্যাপক সুগত সান্যাল ও তাঁদের সহকারীরা যে প্যাকেজটি তৈরি করেছেন, তাতে আপাতত ১৫০ টি শব্দ আছে। এগুলোর মধ্যে যে-কোনও শব্দ উচ্চারণ করলেই তা শুনতে ও বুঝতে পারবে কম্পিউটার। তেমন-তেমন উত্তরও দেবে, তবে আপাতত লিখেই।

শুধু কথা বলা বা শোনাই নয়, কম্পিউটার এখন অন্ধের যষ্টিও। অবশ্য সব দৃষ্টিহীনের ক্ষেত্রে নয়। যাঁদের 'রেটিনা' বা 'অক্ষিপট' মোটামুটি কার্যক্ষম, কিন্তু ছানি পড়ে বা অন্য কারণে চোখে ভাল দেখতে পান না টম ফার্নেস ও তাঁর সহযোগীদের তৈরি 'ভারচুয়াল রেটিনাল ডিসপ্লে' (ভি আর ডি) তাঁদেরই পথ দেখাবে। চক্ষু গোলকের স্নায়ুপূর্ণ আবরণ এই রেটিনাতেই থাকে রড এবং কোণ কোষ। দৃষ্টিশক্তি এই কোষগুলির ওপরই নির্ভর করে। ফার্নেসের যন্ত্র সরাসরি এই রেটিনার ওপরেই কিছু প্রতিবিম্ব তৈরি করে। এই প্রতিবিম্ব আসলে অসদ্‌বিম্ব (ভারচুয়াল ইমেজ), বাস্তবে এর কোনও অস্তিত্ব নেই। ধরা যাক, কেউ চোখে ভাল দেখেন না। একটা বাড়িতে তাঁর নিমন্ত্রণ। যেতে হবে। কোন রাস্তা দিয়ে যেতে হবে জানেন, কিন্তু যাবেন কী করে ? ফার্নেস তাঁকে দেবেন একটি বিশেষ চশমা, আর একটা ছোট্ট কম্পিউটার। এই দুটি জিনিস নিয়েই তাঁর ভি আর ডি। কোন কোন রাস্তা ধরে যেতে হবে, কম্পিউটারের বোতাম টিপে তা জানানো হল। একটি 'স্ক্যান-কনভার্টার' সেই সঙ্কেত ফাইবার অপটিক কেবলের মাধ্যমে পৌঁছে দিল ওই বিশেষ চশমায়। সেখানে আছে 'মাইক্রোস্ক্যানার'। সঙ্কেত অনুযায়ী স্ক্যানার তৈরি করল রঙিন প্রতিবিম্ব (তা রাস্তার ম্যাপ, কোনও চিহ্ন বা মানুষের মুখ যা-ই হোক) এবং তা সরাসরি স্থাপিত হল রেটিনায়। ফলে রেটিনায় প্রতিফলিত ওই অসদ্‌বিম্ব দেখে পথ চলতে আর কোনও অসুবিধেই নেই। সামনের বছরই বাজারে এসে যাচ্ছে ভি আর ডি। টম বলেছেন, আপাতত একটু বড় আর ভারী হলেও বছরখানেকের মধ্যে একটা সিগারেটের প্যাকেটের মতোই ছোট্ট আর হালকা হয়ে দাঁড়াবে গোটা জিনিসটা।

যেমন কম্পিউটারের স্ক্রিনে নানা জ্যামিতিক নকশার কোনটা সুচলো, কোনটা ভোঁতা বুঝতে একটা আঙুল-ঢাকা ('থিম্বল') যথেষ্ট। সেলাইয়ের সময় সুচের খোঁচা ঠেকাতে দরজিরা বুড়ো আঙুল বা তর্জনীতে যেমন আঙুল-টুপি পরিয়ে নেন, এই থিম্বল অবশ্যই তেমন সাধারণ নয়। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এম আই টি) কেনেথ স্যালিসবরি

নতুন কম্পিউটারের জন্য চাই ভয়েস রেকগনিশন সফ্টওয়্যার **ফোটো : শুভজিৎ পাল**

এবং টমাস ম্যাসির তৈরি এই 'হাই-টেক থিম্বল' 'ফ্যান্টম হ্যাপটিক ইন্টারফেস' নামে একটি কম্পিউটার-প্যাকেজের অংশ। ধরা যাক, কম্পিউটারের স্ক্রিনে একটা ত্রিভুজ। আমরা ধরে দেখতে চাই, ত্রিভুজের তিনটে কোনা কতটা সুচলো। হাই-টেক ওই থিম্বল আঙুলে পরে নিলে। আসলে আমাদের আঙুল কোনদিকে কতটা নড়ছে বা যাচ্ছে, তা কম্পিউটারের স্ক্রিনে হুবহু সৃষ্টি করবে ওই থিম্বল। এবং তোমার আঙুলে পালটা চাপ দেবে। তুমি যখন আঙুল নাড়িয়ে ত্রিভুজের শীর্ষ স্পর্শ করছ, তখন একরকম চাপ, ত্রিভুজের গা-টা খরখরে হলে আর একরকম চাপ, নরম হলে আবার আর এক ধরনের চাপ। আঙুলে বিভিন্ন মাত্রার এই চাপেই সূক্ষ্ম-ভোঁতা টের পাবে।

আরও তাক লাগিয়েছেন এম আই টি-এরই আর এক অধ্যাপক হিরোশি ইশি। পৃথিবীর যে-কোনও দূরত্বে থাকা দুটি মানুষ পরস্পরের স্পর্শ অনুভব করতে পারবে তাঁর 'ইনটাচ' প্যাকেজের দৌলতে। এখানে কম্পিউটারের দু'প্রান্তে যুক্ত দুটি কাঠের রোলার। একজন মানুষ একটি রোলারকে যেভাবেই ধরুন, ঠেলুন বা সরান, অন্য প্রান্তের রোলারটিকেও একই ভাবে ঘোরাবে কম্পিউটার। ফলে কম্পিউটারের বোতামে হাত রেখে এক প্রান্তের মানুষ টের পাবেন অন্য প্রান্তের মানুষের হাতের নড়াচড়া। এতটা না হলেও কম্পিউটারকে স্বাদ আর গন্ধ বিচারের এলেম দেওয়ার কাজও এগিয়ে চলেছে। আমরা সবাই জানি, আমাদের জিভে আট থেকে দশহাজার স্বাদ-যন্ত্র বা স্বাদ-কোরক ('টেস্ট বাড্‌স') আছে। এই স্বাদযন্ত্রগুলি সপ্তম ও নবম করোটি স্নায়ুর (ক্রেনিয়াল নার্ভস) শাখার সঙ্গে যুক্ত। খাবারের স্বাদে কোরকগুলি উদ্দীপিত হয়, স্নায়ুশাখার মাধ্যমে সঙ্কেত যায় মস্তিষ্কে এবং মস্তিষ্কের বিশেষ একটি অংশ সেই সঙ্কেত বিচার করে ফিরতি নির্দেশ পাঠায়। অর্থাৎ কোনটা ঝাল, কোনটাই বা মিষ্টি, বুঝতে পারি আমরা। ব্যাপারটা কিন্তু এতটা সরল নয়। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, জিভের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগরক্ষাকারী প্রতিটি স্নায়ুশাখা জুড়ে নির্দিষ্ট একটি প্রক্রিয়া টক-মিষ্টি-ঝালের তফাত করে দিচ্ছে। কী সেই প্রক্রিয়া ?

সেটা জানতেই মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট ব্র্যাডলি তৈরি করেছেন 'ওয়্যারট্যাপ'। আমাদের জিভে প্রতিটি স্বাদযন্ত্রে ৫০ থেকে ৭৫ টি রাসায়নিক স্বাদ গ্রাহক ('রিসেপটর') আছে। এই স্বাদগ্রাহকের কোষগুলি স্বল্পায়ু। একটি কোষের আয়ু দশদিন। আবার একটি কোষের আয়ু দশদিনে ফুরানো মাত্রই তার জায়গা নিচ্ছে আর-একটি কোষ। ব্র্যাডলির 'ওয়্যারট্যাপ' স্বাদকোষের এই ব্যাপক জন্মরহস্য জানতেও সাহায্য করবে। মাত্র মিলিমিটার ব্যাসার্ধের একটি সিলিকন ডিস্ক কাজে লাগিয়েছেন ব্র্যাডলি। ডিস্কে অসংখ্য ছিদ্র (একমাত্র অণুবীক্ষণেই যা ধরা পড়বে), প্রত্যেকটি ছিদ্রই যুক্ত একটি কম্পিউটারের সঙ্গে। সোজা কথায়, ডিস্কটি একটি চালুনি। এখন এই ডিস্ককে জিভে বসিয়ে দিচ্ছেন ব্র্যাডলি। স্বাদযন্ত্রের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগরক্ষাকারী একটি স্নায়ুশাখা কেটে দিয়ে সেখানেই বসানো হচ্ছে ডিস্কটি। গাছের ডাল কাটলে ফের যেমন সেখান থেকে নতুন পাতা বের হয়, তেমনই ওই স্নায়ুশাখা ডিস্কের ছিদ্রগুলির ভেতর দিয়ে ফের বৃদ্ধি পেয়ে স্বাদ যন্ত্রগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়। অর্থাৎ ডিস্কটি পাকাপাকিভাবে জিভে জুড়ে যাওয়ায় স্বাদরহস্যের প্রক্রিয়া কম্পিউটারের পরদায় ধরা পড়ে যেতে আর বাকি নেই।

স্বাদের মতো গন্ধ বিচারেও রহস্য কম নয়। বিশেষত তা যদি হয় গন্ধ শুঁকে রোগ বিচার। মধ্যযুগের চিকিৎসকরা রোগীর নিশ্বাসের গন্ধ থেকে বলতে পারতেন, কী অসুখ তাঁর শরীরে বাসা বেঁধেছে। (অবশ্য মুখের গন্ধ থেকে লিভারের অসুখ সহ বিশেষ কিছু রোগেরই আভাস পাওয়া সম্ভব।) স্কটল্যান্ডে হাইল্যান্ড সাইকিয়াট্রিক রিসার্চ গ্রুপের 'রিসার্চ ফেলো' জর্জ ডড কম্পিউটারকে তেমনই একটা নাক দেওয়ার চেষ্টা করছেন। অবশ্য তেমন ইলেকট্রনিক নাম যে একেবারেই নেই তা নয়। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে খাবারের গুণাগুণ পরীক্ষা বা অন্যত্র রক্তে অ্যালকোহলের মাত্রা বিচার করে ইলেকট্রনিক নাক।

ডডের গন্ধ শোঁকা কম্পিউটার চিপ হবে আরও উন্নত। চিপ কী তা আমরা অনেকেই জানি। অসংখ্য ট্রানজিস্টরযুক্ত একটুকরো এই সিলিকনই কম্পিউটারে দেওয়া যাবতীয় নির্দেশ ও তথ্য বিশ্লেষণ করে। ধরা যাক, এই গন্ধ বিচার করতে পারা চিপ্‌কে টেলিফোনে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। পয়সা ফেলে বা কার্ড 'পাঞ্চ' করে আমরা ফোন করলাম নির্দিষ্ট নম্বরে (আসলে একটা কম্পিউটারকে), আর কথা বলতেই থাকলাম। আমাদের কথার সুযোগে ওই চিপ গন্ধ বিচার করে জানিয়ে দিল, কোন রোগ আমাদের শরীরে আছে বা কোন অসুখের আশঙ্কা আছে।

তবে গন্ধ শুঁকে রোগ বিচারের ক্ষমতা সহজসাধ্য নয়, এজন্য কোন রোগের কী গন্ধ, তার বিস্তারিত ম্যাপ জানতে হবে চিপকে। কী করে ? ডডের মতে, এক-একরকম গন্ধ হল বিভিন্ন জ্যামিতিক ধাঁচের পরমাণুর সমাবেশ। আমাদের নাকের গন্ধ-গ্রাহক বা 'রিসেপটর' এই পরমাণুর সংস্পর্শে এলে তবেই আমরা গন্ধ পাই। সুতরাং রিসেপটরের সঙ্গে হাজার-হাজার গন্ধ পরমাণুর বিক্রিয়া কম্পিউটারের নাক-দর্পণে থাকা চাই। এই কয়েক লক্ষ নানা ধরনের বিক্রিয়া চিনতে শক্তিশালী কম্পিউটার তো চাই-ই, চাই ধৈর্যও। তবে ডড বলছেন, আর মাত্র পাঁচ বছর। তারপরই কেল্লা ফতে।

অরণ্যদেব লি ফক

যাত্রা শুভ হোক...
হে চলমান অশরীরী।
তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ।

হিরোকে দেখো ওয়াম্বো। কপ্টার আসছে। শিগ্‌গিরই পৌঁছে যাব ওয়াকারের টেবিলে।
খুলি পাহাড়ের পাদদেশ থেকে যাত্রা...

ওদিকে ওয়াকারের টেবিলে তখন...
গ্রুপ ফোর... সঙ্কেতের অপেক্ষা করো।

গ্রুপ ফোর, এবার যাও।

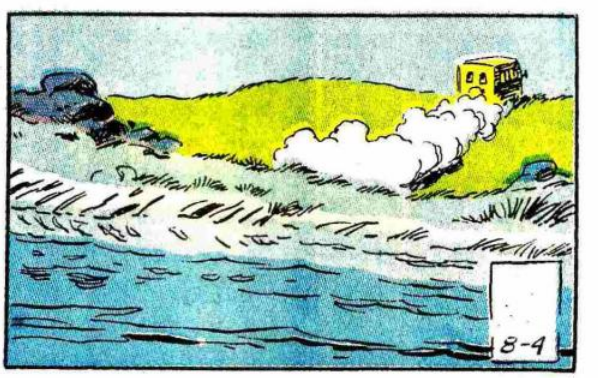
8-4

উঃ। এই রাস্তা দিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া!
দু'ঘণ্টা আগে ছিলাম এখানে।

এর জন্য পড়ল ৪০ লক্ষ ডলার!
তাও এই তো সবে শুরু।

অরণ্যদেব লি ফক

(ক্রমশ)

যে খা নে যা হ চ্ছে

কি-প্যাড

• কি-বোর্ডে কম্পিউটার গেম খেলতে গিয়ে যদি কোনও কি-এর কী কাজ তা মনে রাখতে অসুবিধে হয়, তা হলে 'সাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ'-এর তৈরি কি-প্যাড

ব্যবহার করা যেতে পারে। এর নাম 'পিসি ড্যাশ টাচপ্যাড'। এই প্যাড কি-বোর্ডের প্রতিটি চাবির কী কাজ তা দেখিয়ে দেয়। এতে বিশেষ ধরনের একটি কাগজ ঢুকিয়ে দিয়ে বার-কোড স্ক্যানার চালালে সেই কাগজের ওপর বিভিন্ন কি-এর কাজগুলি মুদ্রিত হয়ে যায়। বিভিন্ন ধরনের 'গেম'-এর উপযোগী টাচপ্যাড কাগজ যন্ত্রটির সঙ্গেই দেওয়া হয়। যন্ত্রটির দাম ৭০ ডলার।

ইন্টেলিমাউস

• বিখ্যাত মাইক্রোসফ্‌ট কর্পোরেশন যে নতুন মাউস বের করেছে, তাতে 'ট্র্যাকবল' ব্যবস্থাও আছে। ট্র্যাকবলের পাশেই আছে একটি ছোট্ট চাকা। বলটি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কম্পিউটারের তথ্যসন্ধানের সঙ্গে-সঙ্গেই চাকাটি ঘুরিয়ে তথ্যগুলিকে 'জুম' অর্থাৎ চোখের আরও কাছে আনা যায়। এই মাউসের নাম দেওয়া হয়েছে 'ইন্টেলিমাউস'। এর ডান দিকে দুটি প্রচলিত বোতামও আছে। মাউসটির দাম ৮৫ ডলার।

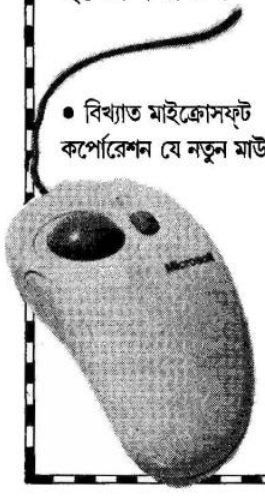

পচনরোধী চাকতি

• অনেক সবজি এবং ফলমূল থেকে ইথিলিন গ্যাস বেরোয়। এই গ্যাসই সবজি ও ফলকে পাকতে সাহায্য করে। আবার এই গ্যাস কখনও-কখনও পচনেরও কারণ হয়ে ওঠে। বিন জাতীয় সবজিতে অতিরিক্ত ইথিলিন জমে গিয়ে তাদের অকালে পাকিয়ে ও পচিয়ে দেয়। এর ফলে গুদামজাত প্রচুর সবজি নষ্ট হয়। এটা ঠেকানোর একটি সহজ ও চমৎকার উপায় বের করেছে ডেনিস গ্রিন লিমিটেড। উপায়টি হল ছোট্ট একটি ফাঁপা চাকতি। এর মধ্যে আছে জিওলাইটের দানা। দানাগুলি পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেটের আস্তরণে মোড়া। এই দুটি রাসায়নিক অতিরিক্ত ইথিলিনকে জারিত করে অকেজো করে দেয়। সবজি বা ফলের মধ্যে এই চাকতি রেখে দিলে সেগুলির অকাল পচন রোধ হয়। এক-একটি চাকতির দাম ৪ ডলার।

সাইকেল বোট

• আজকাল অনেক জায়গায় লেক বা বড় পুকুরে বোটিং-এর ব্যবস্থা থাকে। কলকাতায় নিক্কো পার্কে কৃত্রিম লেকে এ ধরনের বোটিং-এর অভিজ্ঞতা অনেকেরই। এসব ক্ষেত্রে বেশিরভাগই প্যাডেল-বোট ব্যবহার করা হয়। এবং সাইকেলের প্যাডেলের মতোই দুটি প্যাডেল দু'হাতে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নৌকোটিকে চালানো হয়। নটিক্র্যাফ্‌ট কর্পোরেশন যে নতুন ধরনের বোট বের করেছে তাতে প্যাডেল চালাতে হয় সাইকেলের মতোই পা দিয়ে। এতে চালকের

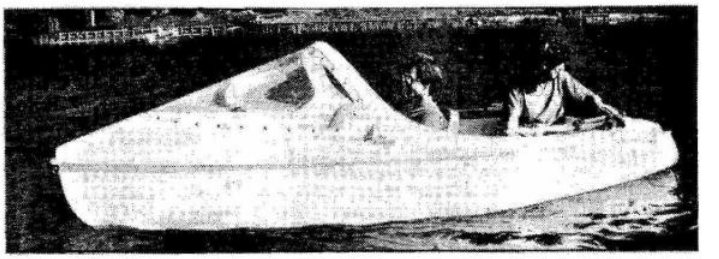

পরিশ্রম যেমন তুলনায় অনেক কমে, বোটের গতিবেগও হয় বেশি। ১২ ফুট লম্বা এই বোটের দাম ২৮৫০ ডলার।

পাখির উৎপত্তি নতুন তথ্য

• ডাইনোসরের বিবর্তনেই পাখির উদ্ভব—এই তত্ত্ব বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত। কিন্তু সম্প্রতি জীববিজ্ঞানীরা এমন কিছু তথ্যপ্রমাণ পেয়েছেন যা থেকে অনুমান করা হচ্ছে, ডাইনোসর পাখির পূর্বপুরুষ নয়, পাখিদের উদ্ভব হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পথে। নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বিশেষজ্ঞ অ্যান সি বার্ক এবং অ্যালান ফেডুসিয়া পাখি ও সরীসৃপের ভ্রূণের বিভিন্ন স্তরের প্রচুর ফোটোগ্রাফ বিশ্লেষণ করে ওই সিদ্ধান্তে এসেছেন। তাঁরা দেখেছেন, সরীসৃপের সামনের দু'পায়ের তিনটি আঙুল মানুষের হাতের বুড়ো আঙুল, তর্জনী ও মধ্যমার অনুরূপ। অন্যদিকে, পাখির পূর্বসুরি কোনও প্রাণীর সামনের পায়ের যে তিনটি আঙুল বিবর্তিত হয়ে পাখির ডানার সৃষ্টি, সেগুলি মানুষের হাতের তর্জনী, মধ্যমা কনিষ্ঠা আঙুলের সঙ্গে মেলে। এ থেকেই দুই বিজ্ঞানী মনে করছেন সরীসৃপ-শ্রেণীর ডাইনোসর থেকে পাখির উদ্ভব হয়নি। তবে এই তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন ডাইনোসরপন্থী একদল বিজ্ঞানী।

এঁটুলি রোগের মোকাবিলায়

• 'লাইম ডিজিজ' বা এঁটুলি রোগের উন্নত টিকা উদ্ভাবনের পথে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য পেয়েছেন আমেরিকার ব্রুকভেন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির একদল গবেষক। সাধারণত জীবজন্তুর এঁটুলি

পোকা ব্যাকটিরিয়া ঘটিত এই রোগ ছড়ায়। এঁটুলির অন্ত্রে লাইম ডিজিজের ব্যাকটিরিয়ার বংশবিস্তার ঘটে। সেই এঁটুলি অন্য কোনও জন্তু বা মানুষকে কামড়ালে তার রক্তে ওই ব্যাকটিরিয়া সংক্রমিত হয়। ১৯৯৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল ১৬ হাজার মানুষ। ব্রুকভেনের গবেষক দল ওই ব্যাকটিরিয়ার দেহের বহিরাবরণে যে প্রোটিন থাকে তার নকল তৈরি করতে পেরেছেন। প্রথমে 'এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফি'-র সাহায্যে মূল প্রোটিনটির গঠন নির্ণয় করে তার কৃত্রিম রাসায়নিক সংস্করণ তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা। 'ওস্‌পা'

নামের ওই প্রোটিনের নকলই টিকা হিসেবে ভাল কাজ করবে বলে তাঁদের ধারণা। এই প্রোটিন আগে থেকে ইনজেকশন করে ঢুকিয়ে দিলে দেহে তার প্রতিরোধী 'অ্যান্টিবডি' তৈরি হবে। পরে লাইম ব্যাকটিরিয়া শরীরে ঢুকলেও ওইসব অ্যান্টিবডি তাদের ঠেকাবে।

হিমায়িত গবেষণাগার

• একটি 'আইসব্রেকার' মানে 'বরফ-ভাঙা' জাহাজকে সুবিশাল এক ভাসমান বরফখণ্ডের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে আর বরফের মধ্যে আটকে গিয়ে খণ্ডটির সঙ্গেই ভেসে চলেছে সেই জাহাজ। এই হল 'ফ্রোজেন ল্যাব' বা হিমায়িত গবেষণাগার। উত্তর মেরুসাগরে, যেখানে দ্বীপের মতো বিশাল বিশাল বরফের খণ্ড ভেসে বেড়ায়, সেখানেই জলবায়ুর হালহদিস জানতে অভিনব ওই পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। প্রকল্পটির নাম 'শেবা', শব্দটি সম্প্রসারিত করলে হয় 'সারফেস হিট বাজেট অব দ্য আর্কটিক ওশান'। গত অক্টোবরে আলাস্কার প্রুধো উপসাগরের ৩০০ মাইল উত্তরে কানাডীয় উপকূলরক্ষীদের একটি বরফ-ভাঙা জাহাজকে ভাসমান বরফের মধ্যে ঢুকিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে। আর সেই জাহাজে অব-শূন্য তাপমাত্রায় অত্যন্ত কঠিন পরিবেশের মধ্যে গবেষণা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। মেরু ভালুকের ভয়ও আছে যথেষ্ট। তাঁরা মুহূর্তে-মুহূর্তে মাপছেন সমুদ্রতলের তাপমাত্রা, বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণ, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি। ১৩ মাসব্যাপী গবেষণার শেষে জলবায়ু তথা আবহাওয়া সম্পর্কে বহু নতুন তথ্যই পাওয়া যাবে বলে বিজ্ঞানীদের আশা।

দূষণ নিরোধী প্র্যাম

• শিশুদের নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্য হাতে ঠেলা ছোট্ট গাড়ি, যার নাম প্র্যাম্ বা প্যারামবুলেটর, হামেশাই দেখা যায়। পার্কে তো বটেই, এমনকী, পথেঘাটেও। এর অনেক সুবিধে। শিশুকে শুইয়ে বসিয়ে নিরাপদে ঘোরানো যায়। কোলে নিয়ে ঘোরার পরিশ্রম বাঁচে। কিন্তু এখন শহরাঞ্চলে বায়ু দূষণ এমনই যে,

এভাবে শিশুদের নিয়ে ঘোরাও সব-সময় নিরাপদ নয়। এই সমস্যা দূর করতে বেবিফ্রিয়ার লিমিটেড নামে একটি ব্রিটিশ সংস্থা দূষণরোধী ঢাকনাওয়ালা একরকম প্র্যাম বের করেছে। ঢাকনাটি বন্ধ করে দিয়ে সুইচ টিপলে একটি ব্যাটারিচালিত ব্লোয়ার ও ফিল্টার চালু হয়ে যায় এবং চাপ খাওয়া বিশুদ্ধ বাতাস ভেতরের অংশটিকে পূর্ণ রাখে। শিশু থাকে নিরাপদ। এর দাম ৮০০ ডলার।

ডুবে যাওয়া জাহাজের সন্ধানে

• পৌনে ৩০০ বছর আগে ১৭১৮ সালে 'অ্যাডভেঞ্চার' নামে একটি জলদস্যু জাহাজ ডুবে গিয়েছিল উত্তর ক্যারোলিনার কাছে অতলান্তিক মহাসাগরে। ব্ল্যাকবিয়ার্ড নামে এক কুখ্যাত জলদস্যু ৪০টি কামান সজ্জিত সেই জাহাজ নিয়ে তখন শাসন করত ভার্জিনিয়া আর ক্যারোলিনার উপকূলস্থ সমুদ্রাঞ্চল। প্রায় এক দশক ধরে গবেষণা চালিয়ে আলট্রাসনিক ম্যাগনেটোমিটারের সাহায্যে সেই জাহাজটির ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পেয়েছে বলে দাবি করেছে 'ইন্টারসাল' নামে একটি সংস্থা। যাদের কাজ হল ধ্বংসাবশেষের অনুসন্ধান। উত্তর ক্যারোলিনার বিউফোর্ট খাঁড়িতে জলের ২০ ফুট নীচে যে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জাহাজের সন্ধান মিলেছে সেটা প্রকৃতই দস্যু ব্ল্যাকবিয়ার্ডের 'অ্যাডভেঞ্চার' জাহাজ কি না তা এখনও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি। কারণ, জাহাজটির ধ্বংসাবশেষের কোনও অংশ এখনও উদ্ধার করা হয়নি। তবে টুকরোটাকরা দু-একটা জিনিস যা পাওয়া গেছে তা থেকে বিশেষজ্ঞদের অনুমান, জাহাজটি ওই সময়েরই। বিশেষ করে একটি ধাতব ঘণ্টা। এ-সম্বন্ধে উত্তর ক্যারোলিনা রাজ্যের সরকারি পুরাতত্ত্ববিদ স্টিভ ক্ল্যাগেট বলেছেন, ঘণ্টাটি যে সেসময়েরই তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এ ছাড়া, ঐতিহাসিক দিক থেকেও এই আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, অত পুরনো কোনও জাহাজের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান এই প্রথম পাওয়া গেল।

বিমল বসু

টিনটিনের অমর স্রষ্টা হার্জের ম্যানিটোবা জাহাজের রহস্য

কপিরাইট : কাস্টারম্যান এস.এ

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

খেলাধুলো

নতুন বলে ইতিমধ্যেই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন আগরকর। উদীয়মান এই বোলার সম্পর্কে আশাবাদী শ্রীকান্ত, গাওস্কর ও টমসনের মতো বিশেষজ্ঞরা। লিখেছেন **অমিতাভ মজুমদার**

শ্রীনাথের যোগ্য সহযোগী হয়ে উঠতে চলেছেন অজিত আগরকর

পাকিস্তান সফর থেকে ফিরে এসে ভারতীয় 'এ' দলের কোচ কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত বলেছিলেন, "ছেলেটি প্রতিভাবান। ও অনেকদূর যাবে। দুর্দান্ত লড়াই করার ক্ষমতা রয়েছে ওর মধ্যে।" সম্প্রতি ভারত সফরে এসে জেম্‌স টমসনের মতো ব্যক্তিত্বও শ্রীকান্তের কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাঁর কথায়, "ছেলেটির বলে যা জোর দেখছি, পার্থ বা ব্রিসবেনের উইকেটে একে আটকানো সত্যিই মুশকিল হবে।" দুই প্রবাদপ্রতিম ক্রিকেটার যাঁর সম্বন্ধে এত উচ্ছ্বসিত, তিনি হলেন এই মুহূর্তে ভারতের অন্যতম উদীয়মান ফাস্ট বোলার অজিত আগরকর। বয়স ২০ বছর পেরোতে না পেরোতেই হইচই ফেলে দিয়েছেন তিনি। অনেকেই বলছেন, শ্রীনাথের যোগ্য সহযোগী হয়ে উঠতে যাচ্ছেন তিনি। খুব সম্প্রতি একদিনের ভারতীয় দলে ডাক পেয়েছেন অজিত আগরকর। ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার আগে 'এ' দলের হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন তিনি। মূলত আগরকরের জন্যই পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জিতেছে ভারত। দু'বার পাঁচটি করে উইকেট পেয়েছেন এবং যে টেস্টে ভারত পাকিস্তানকে হারায়, সেই টেস্টে ন'টি উইকেট নিয়ে 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ'ও হয়েছেন। পেশোয়ার একাদশের বিরুদ্ধে শতরান করেছেন। চ্যালেঞ্জার সিরিজে 'ম্যান অব দ্য সিরিজ' হয়েছেন। পাকিস্তান সফরের আগে শ্রীলঙ্কা সফরেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন আগরকর। শ্রীলঙ্কাকে পর্যুদস্ত করেছে ভারতীয় 'এ' দল। শ্রীলঙ্কা সফরে প্রথম টেস্টে সাতটি উইকেট ও ১৩৫ রান, দ্বিতীয় টেস্টে আরও একটি সেঞ্চুরি এবং তৃতীয় টেস্টে পাঁচটি উইকেট নিয়েছিলেন আগরকর। ফলস্বরূপ অচিরেই ডাক পান ভারতীয় দলে। শচীন তেন্ডুলকর, বিনোদ কাম্বলি ও প্রবীন আমরের পর অজিত আগরকর ভারতীয় ক্রিকেটে রমাকান্ত আচরেকরের নবতম উপহার। মুম্বইয়ের দাদারে শিবাজি পার্কে আচরেকর-সারের কাছে ক্রিকেট শিখেছেন। জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েই অজিত তাই ছুটে গিয়েছেন দ্রোণাচার্য গুরুকে প্রণাম করতে। আচরেকর-সার নিজের বাড়িতে বসে জানান, "আগরকর আমার অন্যতম প্রিয় ছাত্র। ও প্রতিভাবান, ব্যাটিং, বোলিং উভয় বিভাগেই পারদর্শী। শচীনের যোগ্য উত্তরসূরি হয়ে উঠতে পারে অজিত।" রোগা চেহারার, সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা আগরকর স্রেফ গতিতে পাল্লা দিচ্ছেন জাভাগল শ্রীনাথের সঙ্গে। স্বয়ং শ্রীনাথও প্রশংসা করেছেন আগরকরের, "অজিতের হাতে ভার্ল ইনসুইং রয়েছে, ইয়র্কারও করতে জানে।" তবে আগরকরের যে গুণ স্টিভ ও' এবং শেন ওয়ার্নকে মুগ্ধ করেছে, তা হল 'স্টাম্প টু স্টাম্প' বোলিং থেকে সরে না-যাওয়া। চমৎকার লাইন ও লেংথ, দু'দিকেই সুইং করানোর ক্ষমতা এবং ইয়র্কারই আপাতত আগরকরের অস্ত্র। আগরকর যদি নতুন বলে শ্রীনাথের যোগ্য সহযোগী হয়ে উঠতে পারে তবে ভারতীয় ক্রিকেটে সেটাই হবে সবচেয়ে বড় খবর।

অজিত আগরকরের বাড়ি মুম্বইয়ের ওরলিতে। বাবা অচ্যুত আগরকরের রবারের কারখানা রয়েছে। বাড়িতে রয়েছেন মা ও বোন। তবে প্র্যাকটিসের সুবিধের জন্য দাদারে শিবাজি পার্কের কাছে ঠাকুমার সঙ্গেই থাকেন অজিত। পড়েন কলেজে, বাণিজ্য বিভাগে। পশ্চিমাঞ্চলকে ভারত চ্যাম্পিয়ান করে অজিত আগরকর প্রথম পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন অনূর্ধ্ব ১৬ পর্যায়ে। ১৭ বছর বয়সে অবশিষ্ট ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব পান অজিত। ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে মুম্বইয়ের স্টার ক্লাবের হয়ে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় দুর্দান্ত খেলেন তিনি। ইংল্যান্ডে অজিত করেন ৫২৭ রান ও দখল করেন ২৭টি উইকেট। ১৯৯৪-৯৫ সালে কোচবিহার ট্রোফিতে অজিতের সংগ্রহে ৫২৪ রান ও ২৪টি উইকেট। তখন থেকেই ভারতীয় নির্বাচকের চোখে পড়ে যান আগরকর তাঁর নজর-কাড়া পারফরম্যান্সের সুবাদে। শচীনের 'ফ্যান' হলেও আগরকর ভক্ত ভিভিয়ান রিচার্ডসের। শিবাজি পার্কে নিয়মিত ছ-সাত ঘন্টা অনুশীলন করেন আগরকর। সুনীল গাওস্কর কিছুদিন আগে বলেছেন, "ভারতীয় ক্রিকেটে সুদিন আনতে পারে আগরকরের মতো প্রতিভাবান অলরাউন্ডার।"

অনেকদিন পরে ভারত পেয়েছে এক যোগ্য অলরাউন্ডার

ভারতীয় ক্রিকেটে রীতিমত সামর্থ্য নিয়ে এসেছেন হৃষীকেশ কানিতকর। লিখেছেন চিন্ময় রায়

হৃষীকেশ কানিতকর

প্রায়ই একটা কথা বলেন সুনীল গাওস্কর, "আন্তর্জাতিক আসরে সাফল্যের জন্য প্রতিভার চেয়েও বেশি জরুরি মানসিক দৃঢ়তা।" ঢাকায় স্বাধীনতা কাপের ফাইনালে নানা বিপত্তি কাটিয়ে হৃষীকেশ কানিতকর এই মানসিক দৃঢ়তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন রেখেছেন। চূড়ান্ত উত্তেজনার মুহূর্তেও তাঁর মাথা ছিল রীতিমত ঠাণ্ডা। 'স্লগ' ওভারে ঠাণ্ডা মাথায় বল জায়গায় রেখে অস্ট্রেলিয়াকে অতীতে অনেক জয় এনে দিয়েছেন স্টিভ ও'। এজন্য তাঁর অন্য নাম 'আইসম্যান'। হৃষীকেশের শান্ত অবিচল হাবভাব বারবার স্টিভ ও'কে মনে করিয়ে দেয়।

বাবা প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার হেমন্ত কানিতকর। খেলেছিলেন মাত্র দুটি টেস্ট। এখন তিনি আবার জুনিয়ার নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান। হৃষীকেশ কিন্তু স্রেফ নিজের যোগ্যতায়, কোচবিহার ট্রোফিতে (অনূর্ধ্ব-১৯ বছর বয়সীদের) দুর্দান্ত ধারাবাহিকতার দৌলতে ভারতীয় যুব দলে পাকা জায়গা করে নেন ১৯৯৩-'৯৪ মরসুমে। সেবারই প্রথম আসে আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বাদ। অবশিষ্ট ভারতীয় যুব দলের হয়ে ইংল্যান্ডের যুব দলের বিপক্ষে ফরিদাবাদে সেই খেলায় বিশেষ কিছু করতে পারেননি। পরের মরসুমে সফরকারী অস্ট্রেলিয়ার যুব দলের বিপক্ষে ত্রিবান্দ্রমে দ্বিতীয় টেস্টে ১১টি উইকেট নিয়ে ভারতের জয়ে বিশেষ ভূমিকা নেন। এখনকার তারকা ফাস্ট বোলার যেমন গিলেসপি ও মারকুটে ব্যাটসম্যান অ্যান্ড্রু সিমন্ডসের মতো ক্রিকেটার সেই দলে ছিলেন। তিন টেস্টের সিরিজে মোট ১৪৯ রান করেন। উইকেট পান ১৪ টি। '৯৪-এর মাঝামাঝি ভারতীয় যুব দলের সঙ্গে ইংল্যান্ড সফরে যান। পুরো সফরে কোনও সাফল্যই পাননি।

রঞ্জি ট্রোফিতে আবির্ভাব মাত্র ২০ বছর বয়সে মহারাষ্ট্রের হয়ে। ১৯৯৪ সালে মুম্বইয়ের বিপক্ষে শোলাপুরে জীবনের প্রথম রঞ্জি ম্যাচে হৃষীকেশ করেন ৪৪ রান। চতুর্থ ম্যাচেই গুজরাটের বিপক্ষে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রথম শতরানটি করেন। কানিতকর জুনিয়ারের প্রতিভার উজ্জ্বল বিচ্ছুরণ ঘটতে শুরু করে '৯৫-'৯৬ মরসুম থেকে। দুটি শতরান সমেত মোট ৪০১ রান করেন। ভারতীয় দলের 'ফ্রিন্জ' ক্রিকেটারে পরিণত হন '৯৬-'৯৭ মরসুমে। মোট ৯৯৩ রানের সঙ্গে ২১টি উইকেটও পান। এই চমকপ্রদ ধারাবাহিকতার জোরে শ্রীলঙ্কা সফরের আগে সম্ভাব্য ২৭ জনের ভারতীয় দলে ডাক পান। মূল দলে স্থান পাওয়ার ব্যাপারে হৃষীকেশ এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে, মাঝপথে ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি ভেঙে ইংল্যান্ড থেকে চলে আসেন। সেবার স্বপ্নভঙ্গ হলেও সহারা কাপের জন্য টরন্টোগামী দলে তিনি সুযোগ পান। প্রথম এগারোয় জায়গা করে নিতে সময় লেগেছে মাস-দুয়েক। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ইন্দোরে জীবনের প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষিত হওয়ায় ব্যাটিং, বোলিং-এর সুযোগ হয়নি। এর পরই এল ঢাকায় স্বাধীনতা কাপ। হৃষীকেশ চলে এলেন প্রচারের আলোয়।

ঢাকায় নায়ক হয়ে ওঠা যে ক্ষণিকের কোনও সাফল্য নয় তার প্রমাণ মিলেছে দেশের মাটিতে ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতায়। জিম্বাবোয়ের বিপক্ষে দ্বিতীয় খেলায় 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ'। ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে হৃষীকেশ কানিতকরের ছায়া। ব্যাটিং 'স্টান্স'-এ বাঁ হাতিদের সহজাত সৌন্দর্যটি নেই। অনেকটা ইংরেজদের কায়দায় দাঁড়ানো। কোচিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে হৃশীকেশকে ব্যাট করতে দেখে ইয়ান চ্যাপেল বলেন, "অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ব্যাট্সম্যান। উইকেটের চারপাশে ওর সাবলীল মার দেখে আমি মুগ্ধ।" নাড়ি টিপে রোগী দেখার মতো শরীর ও মুখের অভিব্যক্তি দেখে ক্রিকেটার চেনায় ইয়ান চ্যাপেলের জুড়ি নেই। আপ্লুত প্রাক্তন মহাতারকা সুনীল গাওস্কর থেকে এখনকার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। একটু টেনে টেনে অফ স্পিন করেন। অফ স্পিনটা আর একটু পরিমার্জিত করলে দলের সম্পদ হয়ে উঠবেন।

নির্বাচকমণ্ডলীতে নিকট আত্মীয় থাকা মানেই বিতর্ক। জুনিয়ার-নির্বাচন কমিটিতে থাকা হেমন্ত কানিতকর উদ্বিগ্ন, ছেলে ছয় নম্বরে কীভাবে মানিয়ে নেবেন, হৃষীকেশ তিনে খেলতেই অভ্যস্ত। এ ব্যাপারে হৃষীকেশের আদর্শ হওয়া উচিত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। যে কোনও জায়গায়, যে-কোনও পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিয়ে সৌরভ বুঝিয়েছেন চার্লস ডারউইনের 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' তথ্যটি কত নির্ভুল। সকাল বেলা যদি সারাদিনের পূর্বাভাস হয়, তা হলে বলতে হবে হৃষীকেশ কনিতকরও একদিন সফল হবেন।

খেলাধুলো

বাংলার আর-এক নতুন ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন

ক্রিকেটে রীতিমত আশা জাগিয়ে তুলেছেন বাংলার প্রতিভাবান অলরাউন্ডার লক্ষ্মীরতন শুক্লা। তরুণ এই ক্রিকেটারের সঙ্গে কথা বলেছেন সুজন ঠাকুরতা

এই মুহূর্তে বাংলার অন্যতম সম্ভাবনাময় ও প্রতিশ্রুতিমান ক্রিকেটার হলেন লক্ষ্মীরতন শুক্লা। কিছুদিন আগে শেষ হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব কাপে (অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে) নিজের প্রতিভার পরিচয় দেন লক্ষ্মীরতন। দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকে ফিরে ভারতীয় যুবদলের কোচ কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত যে ক'জন তরুণ খেলোয়াড়ের প্রশংসা করেন তাঁদের অন্যতম হলেন বাংলার লক্ষ্মী।

লক্ষ্মীরতন শুক্লা সম্পর্কে শ্রীকান্তের মন্তব্য ছিল, "ছেলেটা প্রতিভাবান, ওর মধ্যে ক্রিকেট আছে এবং ওকে ঘিরে স্বপ্ন দেখা যায়।" তরুণ অলরাউন্ডার লক্ষ্মীরতনের সঙ্গে কিছু কথা হল হাওড়ায় তাঁর বাড়িতে এবং এরিয়ান্স মাঠে বসে।

দরিদ্র পরিবারের সন্তান লক্ষ্মীরতন শুক্লা পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন ১৯৯৫-'৯৬ মরসুম থেকেই। গতবছর কোচবিহার ট্রোফিতে

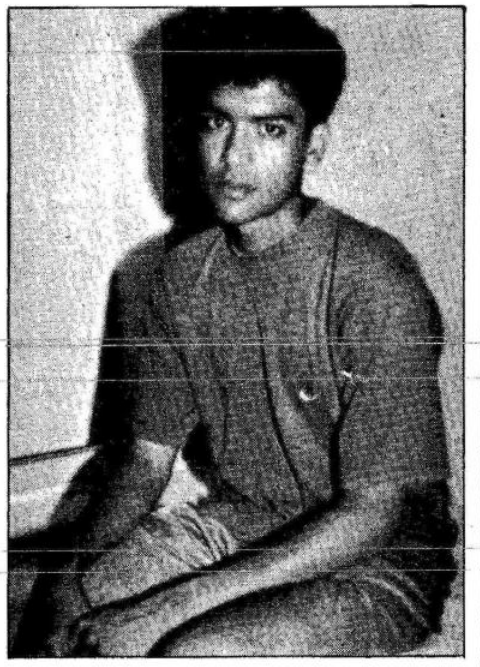

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে অল্প রানে ছয় উইকেট হারিয়ে বাংলা দল যখন বিপদে পড়ে সেই সময় ব্যাট হাতে নেমে বাংলাকে তিনি উপহার দেন ৫১ রানের একটি ঝকঝকে ইনিংস। এ ছাড়াও অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে সি. কে নাইডু ট্রোফিতে মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে মাত্র ১৬ রানের বিনিময়ে তিনটি উইকেট দখল করেছিলেন। গতবছর ডেনিস লিলির অন্যতম প্রিয় ছাত্রের পারফরম্যান্সই বলে দেয় যে, তিনি অনেকদূর যাবেন। যুব বাংলার জয়ের পিছনে অন্যতম অবদান অলরাউন্ডার লক্ষ্মীরতন শুক্লা ও বাংলার অধিনায়ক ধর্মেন্দ্র সিংহের।

কোচবিহার ট্রোফিতে দুর্দান্ত খেলার সুবাদেই এ বছর ভারতীয় যুব দলে ডাক পান লক্ষ্মী। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে বিশ্ব যুবদলে বাংলা থেকে তিনি ছাড়া ডাক পেয়েছিলেন শিবসাগর সিংহও। দক্ষিণ আফ্রিকার কিনিয়া, ইংল্যাণ্ড, পাকিস্তান প্রভৃতি দলকে হারানোর পেছনে বিশেষ ভূমিকা ছিল লক্ষ্মীর। ভারতীয় যুবদলের দুর্ভাগ্য, 'রান রেট' কম থাকার জন্য মর্যাদার লড়াইয়ে পাকিস্তানকে হারিয়েও ফাইনালে তারা যেতে পারেনি। এরিয়ান্স মাঠে বসে সেদিন খুব আপসোস করছিলেন লক্ষ্মী, "কপাল মন্দ, তাই আমরা ফাইনালে যেতে পারিনি।" ভাল খেলার পুরস্কার হিসেবে এ-বছর বাংলার রঞ্জি দলে ডাক পেয়েছেন তিনি মাত্র ১৯ বছর বয়সেই। শুধু তাই নয়, চেন্নাইয়ে এম. আর. এফ. কোচিং ক্যাম্পে ডাক পেয়েছেন লিলির অন্যতম এই প্রিয় ছাত্রটি। লক্ষ্মীর যাবতীয় খরচ বহন করবে এম. আর. এফ-ই। গতবছর এম. আর. এফের কর্ণধার ও প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার টি. এ. শেখর ইডেনে নিজে বাছাই করেছিলেন লক্ষ্মীকে। তবে শুধু অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়েই নয়, ফেব্রুয়ারি মাসে এ. এম. ঘোষ ট্রোফিতে এরিয়ান্সের হয়ে তিনি একাই হারিয়েছেন সৌরভ, সাবা, অরুণলালদের নিয়ে তৈরি শক্তিশালী ইস্টবেঙ্গল দলকে।

খেলার শেষে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অভিনন্দন জানান লক্ষ্মীকে। লক্ষ্মী জানালেন," সৌরভদার কাছ থেকে অভিনন্দন পাওয়ার গুরুত্বই আলাদা।" লক্ষ্মীর প্রিয় ও স্বপ্নের ক্রিকেটারই সৌরভ।

বাঙালি না হলেও লক্ষ্মী ছেলেবেলা থেকেই আছেন পশ্চিমবঙ্গে, লক্ষ্মীর বাড়ি হাওড়ার মালি পাঁচঘড়া থানার নস্কর পাড়া রোডে। বাবা উমেশ কুমার শুক্লার কলকাতার সত্যনারায়ণ পার্কে একটি ছোট কাপড়ের দোকান আছে। কিন্তু দোকানের আয় যথেষ্ট নয় বলে প্রয়োজনের তাগিদে লক্ষ্মীকে মাঝেমধ্যে মেচেদা থেকে পান এনে দোকানে দোকানে সরবরাহ করতে হয়। লক্ষ্মীর দুই ভাই, বড় ভাই প্রকাশ শুক্লাও ক্রিকেটার। কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে খেলেন। লক্ষ্মীর মূল প্রেরণাদাতা হলেন তাঁর বাবাই। এখন দশম শ্রেণীতে পড়েন তিনি। লক্ষ্মীর স্বপ্ন অলরাউন্ডার হিসেবে ভারতীয় দলে খেলা। লক্ষ্মীর যাত্রাপথ মসৃণ করে তুলেছেন গোপাল বসু, গৌতম সোম, কল্যাণ ঘোষাল এবং পলাশ নন্দী ও অরুণলাল প্রমুখ। এঁদের প্রত্যেকের কাছেই কৃতজ্ঞ লক্ষ্মী। লক্ষ্মী সম্পর্কে এরিয়ান্স কোচ ও প্রাক্তন ক্রিকেটার পলাশ নন্দীর মন্তব্য, "ছেলেটার মধ্যে অসম্ভব লড়াকু মানসিকতা আছে। মাঠে হার মানতে চায় না।" গোপাল বসু বলেন, "টেকনিক মজবুত করতে পারলে আগামী দিনের তারকা হতে পারবে লক্ষ্মী।" বাংলার কোচ অরুণলাল জানিয়েছেন, "ছেলেটা সম্ভাবনাময়, সুযোগ পেলে ও নিজেকে প্রমাণ করবেই।"

"ভবিষ্যৎ লক্ষ্য কী?" এই প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মী জানালেন, "অন্য সব ক্রিকেটারের মতো আমারও স্বপ্ন ভারতীয় দলে খেলা।" আশা করা যায়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সাবা করিমের পর লক্ষ্মী রতন শুক্লাই হবেন বর্তমান ভারতীয় দলে বাংলার তৃতীয় ক্রিকেটার।

সম্পূর্ণ উপন্যাস

জাম্বো ডিমের অন্দরে

তপন সেন

(শে ষাং শ)

ওরা ছ'জন শেষ দরজার উদ্দেশ্যে যতই সামনের দিকে এগোতে লাগল, ততই দেখা গেল, আলোর তীব্রতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। যখন শেষ দরজাটার কাছে গিয়ে পৌঁছল ওরা, তখন ভালভাবে চোখ খুলতেও কষ্ট হচ্ছিল ওদের। মরগোশ তার পকেট থেকে একটা কালো চশমা বের করে পরল। অন্য পকেট থেকে একটা চাবি বের করতে করতে বলল, "আমি চোখ খুলে রাখতে পারছি না। তোমরা কেউ চাবির ফুটোটা দেখতে পাচ্ছ কি ?"

"এত আলো এল কোত্থেকে ?" দু'হাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল ভিজে।

"সোনা, রুপো, হিরে, জহরত, এইসব উজ্জ্বল খনিজ পদার্থ দিয়ে দরজাটাকে বানানো হয়েছে," মরগোশ বলল, "তার ওপর প্রচুর বিদ্যুতের আলো পড়ে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। একবার দরজা খুলে ওপাশে যেতে পারলে আর ঝামেলা নেই। "

শেষপর্যন্ত, চাবির ছিদ্রটা চোখে পড়ল নর্তনের। মরগোশ তার হাতের চাবি এগিয়ে দিল নর্তনের দিকে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল নর্তন। তার পেছন-পেছন বাকি সবাই। পেছন ফিরে দরজাটা আবার দ্রুত বন্ধ করে দিল মরগোশ। তারপর দু'হাতে চোখ রগড়াতে লাগল।

চোখের অস্বস্তিটা কেটে যাওয়ার পর সবাই চেয়ে দেখল, দরজার এপাশটা মোটেই ওপাশের মতো নয়। চারদিকে আলো, কিন্তু তাতে কারও চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে না। সামনে একটা বিরাট মাঠ চোখে পড়ল ওদের। মাঠের ঘাস আগাগোড়া একেবারে সমান করে ছাঁটা। মাঝে-মাঝে এখানে সেখানে গাছ। বাঁ দিকে ছোট একটা নদী, এবং ডান দিকে মাঝারি আকৃতির একটা পাহাড়। পাহাড়ের গায়ের ঘাসও একেবারে সমান করে ছাঁটা। দেখে মনে হল, কাস্তে নয়। ঘাসগুলো যেন যন্ত্র দিয়ে ছেঁটে সমান করে দেওয়া হয়েছে।

মরগোশকে চাবি ফেরত দিতে দিতে নর্তন বলল, "আমরা কি অতীত কালে পৌঁছে গেছি ?"

"না রে বাবা !" মরগোশ হাসল, "অতীত, ভবিষ্যৎ, সবই আসবে এই যন্ত্রটার মারফত। এতে তো এখনও হাতই ঠেকাইনি !" মরগোশ ওর পকেট থেকে রিমোট-কন্ট্রোলটা বের করে নর্তনকে দেখাল।

"তা হলে আর দেরি করার দরকার কী, বাপু ? যন্ত্রটা চালু করো, তারপর, চলো যাই, একেবারে নিয়ানডারথালদের যুগে," চেঁচিয়ে উঠল সলিল।

"তুমি বুঝি সেই বংশীধারী কেষ্টঠাকুরকে খুঁজে বের করতে চাও ? যিনি হাড়ের বাঁশিটা বাজিয়েছিলেন আজ থেকে আশি হাজার বছর আগে ?" জিজ্ঞেস করল নর্তন।

"হ্যাঁ, তা-ই তো !" হেসে বলল সলিল।

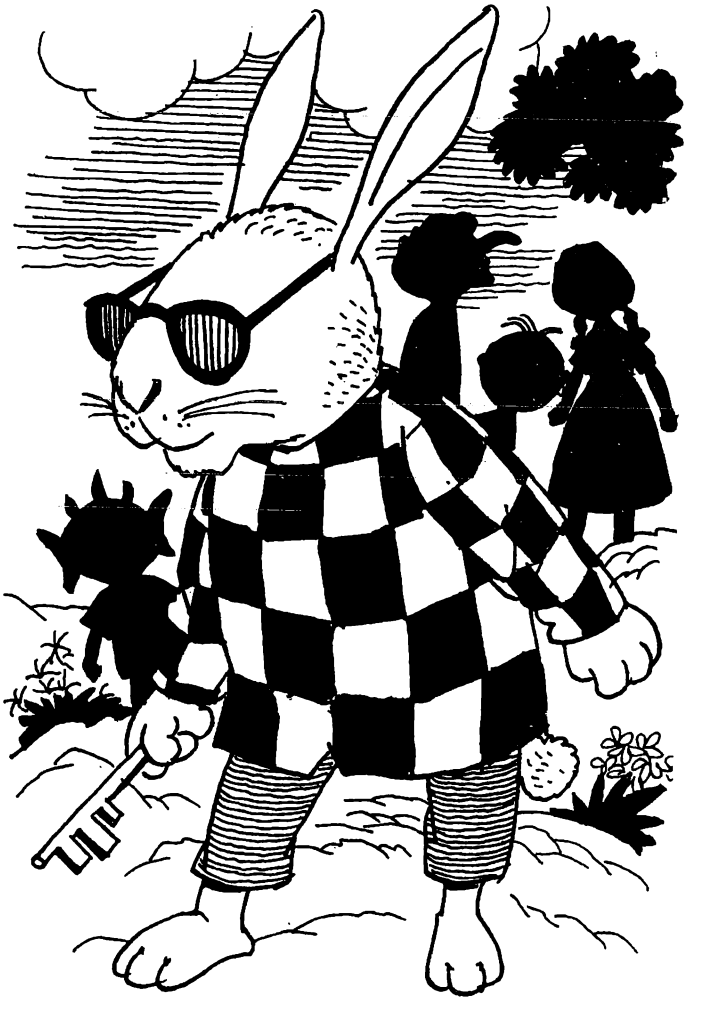

"এত তাড়া কিসের তোমার ?" মরগোশ বলল, "আস্তে-আস্তে এগোলে, মানে, আস্তে-আস্তে পেছোলে, ক্ষতি কী ?"

সলিল মরগোশের কথায় হেসে ফেলল, কোনও উত্তর দিল না।

"'পেছোনো' মানে ? আমরা কি পিছিয়ে যাচ্ছি নাকি ?" চন্দ্রবদনের ভুরু কুঁচকে গেল।

"পিছিয়েই তো যাব আমরা, অতীতের দিকে যাব," বলল সলিল, "পেছোতে পেছোতে একেবারে ডাইনোসরের যুগে গিয়ে থামব আমরা। "

"ডাইনোসর কত কোটি বছর আগেকার জীব, তা কি খেয়াল আছে তোমার ?" নর্তন হাসল সলিলের দিকে ফিরে।

"যত কোটিই হোক, মানে, যত রিমোটই হোক, আর পরোয়া করি না। হাতে যখন 'রিমোট-কন্ট্রোল' আছে, তখন চিন্তা কিসের ?" নর্তনের মতো সলিলও দু'পাক নেচে নিল এবার।

সলিলের কথায় হেসে উঠল ভিজে, তারপর চোখ টিপে বলল, "ডাইনোসরদের যুগে পৌঁছেই বা থামবার দরকার কী বাপু ? পেছোতে পেছোতে একেবারে পৃথিবীর জন্মের সময়ে গিয়ে হাজির হলেই বা ক্ষতি কিসের ?"

"পৃথিবীর জন্মের সময় গিয়ে হাজির হওয়ার বিপদ আছে ভাই," বলল মরগোশ, "সে প্রচণ্ড গরমে আমরা কেউ টিকব না। সব ধোঁয়া হয়ে যাব। যাই হোক, এখন আর অন্য কথা নয়, এবার কাজে নেমে পড়া যাক। রিমোট-কন্ট্রোলের গায়ে এই যে বোতামটা তোমরা দেখছ, এটা টিপে আমরা অতীতের দিকে যাব। তার পাশের এই ছোট্ট বোতামটা দিয়ে স্পিড কন্ট্রোল করতে হয়। যখন আমরা অতীতের দিকে যাব, তখন সবই চোখে পড়বে আমাদের, এবং সবই কানে আসবে। কিন্তু, ওখানকার যারা বাসিন্দা, তারা আমাদের দেখতে পাবে না। "

"তা হলে আর মজাটা কোথায়, বাপু ?" চেঁচিয়ে উঠল সলিল, "ওদের সঙ্গে যদি কথাই না বলতে পারলাম ?"

"এত ব্যস্ত হোয়ো না, সে ব্যবস্থাও আছে," মরগোশ অভয় জানাল সলিলকে, "এই যে তিনকোনা বোতামটা দেখছ, এটা টিপলে আমরা আর অদৃশ্য থাকব না, ওরাও তখন দেখতে পাবে আমাদের। "

"বাঁচালে বাবা !" সলিল হাঁফ ছাড়ল।

"শুধু তা-ই নয়," মরগোশ বলতে লাগল, "ওটার ঠিক পাশেই এই যে চৌকো বোতামটা দেখছ, এটা টিপলে আবার আমরা অদৃশ্য হয়ে যাব ওদের কাছে !"

"বাঃ, ব্যবস্থাটা তো বেশ ভাল," নর্তন বলল, "যদি কোনও কারণে হঠাৎ আমরা অসুবিধের মধ্যে পড়ি, তখন চৌকো বোতাম টিপে অদৃশ্য হয়ে গেলেই হবে। "

"ঠিক, ঠিক," চেঁচিয়ে উঠল ইমামি, "পাগলা ষাঁড়ে তাড়া করলেও, ভাবতে হবে না, কেমন করে তাকে ঠেকাব। বোতাম টেপো, তারপর উধাও হয়ে যাও। বরং, পাগলা ষাঁড়টাই ভ্যাবাচাকা খেয়ে ভাববে, 'এ আবার কী ?'"

"শুধু পাগলা ষাঁড় নয়, পাগলা হাতি, পাগলা রাইনো, এমনকী পাগলা ডাইনোসর হলেই বা চিন্তা কীসের ?" চন্দ্রবদনের কল্পনাও উদ্দাম হয়ে উঠল এবার।

"কী মজা ? কী মজা ? রাইনোই হোক, ডাইনোই হোক, কাউকেই আর পরোয়া করি না আমরা," আনন্দে আবার দু'পাক নেচে নিল নর্তন।

"'রাইনো' আর 'ডাইনো' শুনে মনে পড়ে গেল আমার," বলল মরগোশ, অতীত এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুটো কবিতা আছে। যখন কেউ অতীত বা ভবিষ্যতের দিকে যায়, তখন সেই কবিতাদুটোর একটা পড়তে হয়। যেহেতু, আমরা অতীতের দিকে চলেছি, তখন অতীতের কবিতাটাই পড়া যাক। যখন ভবিষ্যতের দিকে যাব, তখন আবার ভবিষ্যতেরটা পড়া যাবে। "

"কবিতা-টবিতা সেরে ফ্যালো শিগ্‌গির," সলিল তাড়া লাগাল আবার, "তারপর চলো, সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ি অতীতকালের উদ্দেশে। "

মরগোশ মাথা নাড়ল, তারপর শুরু করল :

জাম্বো ডিমের অন্দরে,
নেই জীবনের দ্বন্দ্ব রে,
দেশটা শুনি অনেক সোনার, অনেক রুপোর দেশ,—
গোমেদ, চুনি অঢেল আছে,
হিরের ড্যালাও হাতের কাছে,
যতই তুমি পকেট ভরো, নয় কিছুতেই শেষ।

জাম্বো ডিমের অন্দরে,
পাতাল গিরির কন্দরে,
সেদিন কিন্তু জীবন ছিল, তরতাজা সব প্রাণ,—
ডাইনো ছিল, রাইনো ছিল,
বাঁচার নানান আইনও ছিল,
আজ সেখানে শুনবে শুধু সরীসৃপের গান।

জাম্বো ডিমের অন্দরে,
নামব ঘুমের বন্দরে,
পৌঁছে যাব নানক, কবীর, অশ্বঘোষের কালে,—
সাহস ছিল, শৌর্য ছিল,
শুঙ্গ এবং মৌর্য ছিল,
অতীত দিনের সেই জগৎটা হারিয়ে গেছে হালে।

জাম্বো ডিমের অন্দরে,
আদিম কালের গন্ধ রে,
সেই যেখানে সেদিন ছিল ডাইনোসরের বাস,—
আজ যদি কেউ যায় সেখানে,
এখন শুধু শুনবে কানে,
ডাইনোসরের হাড়ের মধ্যে কালের দীর্ঘশ্বাস।

"তোমার ওই জাম্বো ডিমটা আর কতদূর গো ?" জিজ্ঞেস করল চন্দ্রবদন।

"সেটা এখনও জানতে পারোনি বাপু," সলিল হেসে ফেলল, "আমরা তো জাম্বো ডিমের ভেতর ঢুকেই পড়েছি কোন কালে !"

"তার মানে ?" চন্দ্রবদনের ভুরু কুঁচকে গেল।

"তোমাদের এই পৃথিবীটাই হল জাম্বো ডিম, বুঝলে, চাঁদু ভাই," বলতে বলতে আবার এক পাক নেচে নিল নর্তন।

"কিন্তু, পৃথিবীর চেহারা তো ঠিক ডিমের মতো নয় !" চন্দ্রবদনের সন্দেহ তবুও ঘুচল না।

"সব ডিমের চেহারাই যে তোমাদের ওই হাঁসের ডিম বা মুরগির ডিমের মতোই হতে হবে, এমন কোনও আইন আছে নাকি কোথাও ?" হেসে বলল মরগোশ।

"'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিমে'র চেহারা যে প্রিজ্‌ম-এর মতো নয়, তেমন গ্যারান্টি কি কেউ দিতে পারে ?" তিন চোখই একসঙ্গে টিপল ভিজে।

"শুধু প্রিজ্‌ম কেন, পিরামিড-এর মতো হলেই বা কে আটকাচ্ছে ?" মরগোশ বলল।

"বুঝেছি, বাপু, বুঝেছি। এমনকী বুনো হাতির বা সিন্ধুঘোটকের বাচ্চার মতো হওয়ার চান্সও পুরোমাত্রায় আছে, তাই তো ?" লজ্জিত চন্দ্রবদন

কবুল করল, "সে যাই হোক, ও-কথা যেতে দাও, তোমার ওই কবিতাটাতে কেমন যেন একটা দুঃখের সুর আছে, তাই না ?"

"সে তো থাকতেই পারে," মরগোশ ঘাড় নাড়ল, "এককালে জীবন ছিল সেখানে, আজ আর নেই, সেদিক দিয়ে ভাবলে ব্যাপারটা তো দুঃখেরই !"

"দুঃখ আর থাকবে না রে," নাচতে নাচতে বলে উঠল নর্তন, "এক্ষুনি জীবনের স্রোত বয়ে যাবে সেখানে। " নাচতে-নাচতে সামনের দিকে এগিয়ে গেল নর্তন। তারপর নাচের তালে তালে সুর দিয়ে গেয়ে উঠল, "আমরাই তো জীবন !"

"চলো, এবার তা হলে বেরিয়ে পড়া যাক," বলল ভিজে, "প্রথমে, একশো বছর পিছিয়ে গিয়ে দেখা যাক, সেই সময়টা কেমন ?"

"মোটে একশো ?" ভুরু কুঁচকে ভিজের দিকে ফিরে চাইল সলিল, তারপর বলল, "আইডিয়াটা অবশ্য মন্দ নয়, অল্প অল্প করে এগনোই বোধ হয় ভাল !"

মরগোশ ঘাড় নাড়ল সলিলের কথায়, তারপর যন্ত্রটার স্পিড অ্যাডজাস্ট করে ওপরের বড় বোতামটা আধ সেকেন্ডের মতো টিপে ধরল। পলক ফেলতে না ফেলতে ওরা গিয়ে হাজির হল ১৯০০ সালে, একেবারে বিংশ শতাব্দীর জন্মকালে।

হকচকিয়ে গিয়ে ওরা দেখল, ওরা নিজেরা ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এবং একটা রাস্তায় ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই একটা বাড়ি, তার সামনের দরজা দিয়ে একটা ডিসপেনসারি ঘর চোখে পড়ল ওদের। কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখল, ঘরটার দেওয়ালের গায়ে কাঠের একটা তক্তা লাগানো আছে। তাতে লেখা রয়েছে, ডক্টর কে. কে. খাস্তগির। উঁকি মেরে দেখা গেল, ভেতরে স্টেথোস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে বসে আছেন জবরদস্ত ডাক্তারবাবু। পায়ে অক্সফোর্ড জুতো, পরনে ধুতি, গায়ে শার্ট। শার্টটাকে ধুতির নীচে গুঁজে দেওয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ধুতিটা যাতে খুলে না পড়ে যায়, সেইজন্যে একটা বেল্টও বাঁধা রয়েছে ডাক্তারবাবুর কোমরে।

"আমরা যে একশো বছর পিছিয়ে এসেছি, সেটা কিন্তু ডাক্তারবাবুর পোশাক দেখেই মালুম হচ্ছে," সলিল বলে উঠল।

ওরা মুচকি হেসে ঘাড় নাড়ল সলিলের কথায়। "রসিক, তুমি মেডিক্যাল এনসাইক্লোপিডিয়াখানাকে কোলে নিয়ে বসে কী করছ ?" ডাক্তারবাবুর গম্ভীর গলা শোনা গেল।

"কিছুই করছি না, ডাক্তারবাবু," ঘরের কোণ থেকে একটা ছোট ছেলের গলার আওয়াজ কানে এল ওদের।

ডাক্তারবাবু ভুরু কুঁচকে ঘরের কোণের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন।

সলিলরা সকলের অলক্ষ্যে আস্তে-আস্তে ভেতরে ঢুকল। দেখল, ঘরের অন্যদিককার কোণে টুলের ওপর বসে রয়েছে ন'-দশ বছরের একটা ছেলে, তার কোলের ওপর খোলা রয়েছে মোটা একটা বই। ডাক্তারবাবুর দিকে মুখ তুলে ছেলেটা শুকনো মুখে বলল, "বইটার ভেতর আমি শুধু খুঁজে দেখছি, কোন কোন রোগ আমার নেই !"

"তার মানে ?" ভুরু কুঁচকে চশমার ওপর দিয়ে রসিকের দিকে চেয়ে দেখলেন ডাক্তারবাবু।

"গত একঘণ্টা ধরে বই থেকে যে ক'টা রোগের লক্ষণ আমি পড়ে দেখলাম, তার সবক'টাই আমার রয়েছে, ডাক্তারবাবু," কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল রসিক, "এত রোগ নিয়ে কীভাবে যে আমি এখনও বেঁচে রয়েছি, কে জানে ?"

"ঠিক আছে, তুমি বই রেখে এদিকে এগিয়ে এসো," বললেন ডাক্তারবাবু, "আমি দেখছি, সত্যি-সত্যি তোমার ক'টা রোগ !"

রসিক বই রেখে এগিয়ে এল। ডাক্তারবাবু রসিকের নাড়ি টিপলেন, স্টেথোস্কোপ দিয়ে ওর বুক পরীক্ষা করলেন, তারপর ওর দিকে বেশ কয়েক পুরিয়া ওষুধ এগিয়ে দিয়ে বললেন, একটা পুরিয়া দিয়ে তুমি বড় এক গেলাস জল খাবে কাল সকাল আটটায়। আর একটা দিয়ে বড় আরও এক গেলাস জল খাবে ইস্কুল থেকে ফিরে, তারপর শোওয়ার আগে অন্য একটা পুরিয়া দিয়ে আবার বড় এক গেলাস জল খাবে। মনে রেখো, প্রত্যেকবারই বড় গেলাসে জল খাবে, কেমন ? এখন বাড়ি যাও, গিয়ে একটু বিশ্রাম করো। "

"আমার ক'টা রোগ আপনি দেখলেন, ডাক্তারবাবু ?" রসিকের ভঙ্গি তখনও কাঁদো-কাঁদো।

"দু'টো !" আবার চশমার ওপর দিয়ে রসিকের দিকে ফিরে চাইলেন ডাক্তারবাবু, তারপর আবার বললেন, "তোমার আসল রোগ হল, যে বিষয়ে তোমার কোনও জ্ঞান নেই, তাই নিয়ে পণ্ডিতি করা !"

"আর, অন্যটা ?" রসিক ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে ফিরে চাইল আবার।

"বলাই," মাথা নেড়ে বললেন ডাক্তারবাবু, "তোমার অন্য রোগটা হল, তুমি মোটেই জল খাও না। দিনে যাতে অন্তত তিন গেলাস জল খাও, তার জন্যে কিছু পুরিয়া দিয়ে দিলাম। যে ক'টা দিন পারো, একটু জল খেয়ো। " রসিক পেছন ফিরতে, আর একজন রোগীর দিকে ফিরে গলা নিচু করে ডাক্তারবাবু বললেন, "পুরিয়াগুলো আর কিছু নয়, প্লেন চিনির গুঁড়ো। "

রসিক মাথা নিচু করে ডিসপেনসারি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার পেছন পেছন সলিলরাও বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

রাস্তায় পা দিয়ে মরগোশ জিজ্ঞেস করল, "এবার কোনদিকে ?"

"একটু দাঁড়াও, ভাই," হাত তুলে বলল ভিজে, "উনিশশো সালটাকে আর একটু দেখে নিই। "

ফুটপাথ ধরে কিছুদূর যেতেই দেখা গেল, একটা ঘোড়ার গাড়ি ধীর গতিতে চলে গেল ওদের পাশ দিয়ে। গাড়ির মাথার ওপর বসে রয়েছে চালক, সে ঘোড়ার গায়ে ছড়ি চালাচ্ছে মাঝে-মাঝে। গাড়ির দরজা বন্ধ রয়েছে বলে ভেতরের যাত্রীদের কাউকেই দেখতে পাওয়া গেল না। একটু বাদে ঘোড়ার গাড়ির পাশ দিয়ে একটা মোটরগাড়ি বেরিয়ে গেল সাঁ করে, হর্ন বাজিয়ে পোঁ পোঁ আওয়াজ করতে করতে।

এমন সময় ফুটপাথ ধরে এগিয়ে এল আট-ন' বছর বয়েসের একটা ছেলে, এবং তার পেছনে বয়স্ক এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের মাথায় ছাতা, ছেলেটার হাতে একটা লাট্টু। সে শূন্যেই লাট্টু ঘোরাতে ঘোরাতে চলেছে।

বয়স্ক ভদ্রলোক হাঁকলেন, "গঙ্গাধর, লাট্টুটা এবার পকেটে রেখে দে। আমাদের এক্ষুনি ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে হবে একবার। "

বলা বাহুল্য, সলিলরা সবই দেখতে পাচ্ছিল এবং সকলের কথা শুনতে পাচ্ছিল। রাস্তায় অন্য লোকেরা অবশ্য ওদের অস্তিত্বের কথা জানতেও পারছিল না।

সলিল ফিসফিস করে নর্তনকে বলল, "ওই পুঁচকে ছেলেটার নাম হল গঙ্গাধর। আমার দাদুর বাবা, অর্থাৎ প্রপিতামহের নামও গঙ্গাধর ছিল। "

"হয়তো এই ছেলেটা সত্যিই তোমার প্রপিতামহ। " নর্তন চোখ বড়-বড় করে বলল।

"যাঃ, তা কি কখনও হয় নাকি ?" সলিল হেসে ফেলল নর্তনের কথায়।

ওপাশ দিয়ে আর একটি লোককে হনহন করে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। দূর থেকেই লোকটি বয়স্ক ভদ্রলোকের দিকে দু'হাত জড়ো করে

নমস্কার জানাল, তারপর বলল, "নমস্কার, চৌধুরীমশাই ! নাতিকে নিয়ে কোন্‌দিকে চললেন ?"

সলিল উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "দেখেছ ? দেখেছ ? ছেলেটার নাম গঙ্গাধর চৌধুরী। আমার দাদুর বাবার নামও গঙ্গাধর চৌধুরী ছিল !"

নর্তনও উত্তেজিত হল, বলল, "হয়তো ছেলেটা সত্যিই তোমার দাদুর বাবা। ভুলে যাচ্ছ কেন, আমরা একশো বছর পিছিয়ে এসেছি। তুমি তো জন্মাওনি তখনও। শুধু তুমি কেন, আমরা কেউই তখন জন্মাইনি !"

"আমি ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে চাই," সলিল উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে, "আমাদের সাতপুরুষের নাম আমার মুখস্থ আছে, আমি মিলিয়ে দেখতে চাই, এই ছেলেটা সত্যিই আমার দাদুর বাবা কি না ?"

মরগোশ রিমোট কন্ট্রোলটা সলিলের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, "এই যে তিনকোনা বোতামটা দেখছ, এটা টিপলেই ওরা তোমাকে দেখতে পাবে, তোমার কথাও শুনতে পাবে। কিন্তু সাবধান ! বেফাঁস কোনও কথা বোলো না, বেমক্কা কোনও কাজ কোরো না। রিমোট কন্ট্রোল হারালে কিন্তু বিপদ হবে, আমরা এখানেই আটকে পড়ব, কিছুতেই আর আমাদের কালে ফিরে যেতে পারব না। "

যন্ত্রটা হাতে নিতে নিতে ঘাড় নাড়ল সলিল, তারপর তিনকোনা রইল ! নিজের চেহারাটাও সলিলের চোখে এতক্ষণ অদৃশ্য ছিল, সেটা আবার দৃষ্টিগোচর হল। জোর কদমে সামনের দিকে এগিয়ে গেল সলিল, তারপর ছেলেটার হাত ধরে বলল, "খোকা, তোমরা নাম কী, ভাই ?"

খোকা উত্তর দেওয়ার আগেই খোকার গার্জেন সামনে এগিয়ে এলেন। সন্দেহের চোখে সলিলের দিকে চাইতে চাইতে বলে উঠলেন, "কে রে তুই ? কোত্থেকে এসে হাজির হলি এখানে ? তোকে তো এ মুলুকে আগে কখনও দেখিনি ?"

সলিল ভয়ে ভয়ে উত্তর করল, "আমরা অল্প ক'দিন হল এ-পাড়ায় এসেছি। আপনি কি ওর দাদু ?"

"আমি কে, এক্ষুনি জানতে পারবেন আপনি, কিন্তু আপনি কে, সেটা আমার আগে জানা দরকার," বৃদ্ধ দৃঢ় মুষ্টিতে সলিলের হাত ধরলেন, তারপর কড়া চোখে তাকিয়ে বললেন, "তোর হাতে ওটা কী রে ?"

সলিল ডান হাতের রিমোট কন্ট্রোলটা পেছন দিকে আড়াল করার চেষ্টা করল।

মরগোশ ফিসফিস করে বলে উঠল, "এই মরেছে !"

সলিল বুড়োর বজ্রমুষ্টি থেকে নিজের হাত ছাড়াতে চেষ্টা করতে লাগল, বুড়ো চেঁচিয়ে উঠলেন, "উপেন, শিগ্‌গির এদিকে এসো তো ! দ্যাখো তো ছোঁড়াটার কী মতলব ? গঙ্গাধরের হাতের সোনার তাগাটা হাতাবার চেষ্টায় আছে কি না, কে জানে ? গায়ে দেখছি, ধোপদুরস্ত শার্ট-প্যান্ট। মনে হচ্ছে, মহারাজ একেবারে খাস বিলেত থেকে আমদানি হয়েছেন আজই !"

উপেন নামধারী ব্যক্তিকে যমদূতের মতো এগিয়ে আসতে দেখা গেল হনহন করে। পরিস্থিতি দেখে সলিলের মুখ-চোখ একেবারে শুকিয়ে গেল। তার মধ্যেও সে লক্ষ করল উপেন, বৃদ্ধ এবং ছেলেটি,— তিনজনের পরনেই ধুতি। উপেনের গায়ে ধুতি ছাড়া আর কোনও বস্ত্র নেই, অন্য দু'জনের গায়ে অদ্ভুত চেহারার দুটি জামা। সলিলের মনে হল, এগুলোকেই বোধহয় 'দোলাই' বা 'ফতুয়া' বলত এককালে।

এদিকে বৃদ্ধ বকেই চলেছেন, "শিরোমণি চৌধুরীকে যমের মতো ভয় করে না, এমন মানুষ এ-তল্লাটে নেই। এ ছোঁড়া কিনা সেখানেই নাক গলাতে এসেছে !"

"পাগলা ষাঁড় ! পাগলা ষাঁড় !" চেঁচিয়ে উঠল সলিল, "শিগ্‌গির পালিয়ে চলুন ওধারে !" পাগলা ষাঁড়ের ভয়ে মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হলেন শিরোমণি চৌধুরী, সেই সুযোগে এক ঝটকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল সলিল, তারপর দ্রুত রিমোট কন্ট্রোলের চৌকো বোতামটা টিপে ধরল। ব্যস, নিমেষের মধ্যে ও আবার অদৃশ্য হয়ে গেল এই দৃশ্যমান জগৎ থেকে।

"খুব বেঁচে গেছ, ভাই," চেঁচিয়ে উঠল মরগোশ, "আর একটু হলেই সর্বনাশ হত আমাদের !"

"বুড়োটা ভীষণ বদমাশ তো !" ভিজে বলে উঠল।

বিরাট একটা নিশ্বাস ছেড়ে সলিল বলল, "আমার দাদুর বাবার নাম ছিল গঙ্গাধর চৌধুরী, এবং তাঁর দাদুর নাম ছিল আনন্দ চৌধুরী। সুতরাং শিরোমণি আমার পূবরপুরুষ নন !"

"শিরোমণিটা যে বদমাশের শিরোমণি, তাতে সন্দেহ নেই," বলল নর্তন, "ভাগ্যিস, ও তোমার পূর্বপুরুষ নয় !"

সলিলের মুখে এতক্ষণ বাদে হাসি ফুটল, সে মাথা নেড়ে বলল, "ভাগ্যিস !"

"একেবারে জোর করে কিছু বলা যায় না, ভাই," ভিজে তিন চোখই টিপল একসঙ্গে, "এমনও হতে পারে, গঙ্গাধর সত্যিই তোমার দাদুর বাবা, এবং শিরোমণিও ওরই দাদু। হয়তো, শিরোমণি ওর বাবার বাবা নয়, মায়ের বাবা। অর্থাৎ paternal দাদু নয়, maternal দাদু !"

"হোক গে। " ঠোঁট উলটে বলল সলিল, "সত্যি কথা বলতে কী, অতদিন আগেকার পূর্বপুরুষদের নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানে হয় না। " মরগোশের দিকে ফিরে আবার সে বলল, "চলো, আবার আমাদের যাত্রা শুরু হোক !"

যন্ত্রটা টিপবার আগে ওরা পেছন ফিরে দেখল, শিরোমণির দল একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

সভয়ে চারদিকে চাইতে চাইতে শিরোমণি বলে উঠলেন, "উপেন, এ কি ভৌতিক ব্যাপার নাকি ? মুহূর্তের মধ্যে ছেলেটা একেবারে ভ্যানিশ হয়ে গেল ?"

শিরোমণির কথায় ওরা সবাই হাসল, তারপর মরগোশ ওদের দিকে ফিরে বলল, "বলো, এবার কোন দিকে যেতে চাও ? মানে, কোন কালে ?"

"কালিদাসের কালেই চলো," মাথা নাড়ল সলিল।

"কালিদাসের সঙ্গে দেখা হলে আমি বলে আসব," বলল নর্তন, "আপনি তো, দাদু, কেবল নামেই আছেন, এই দেখুন, আমরা কেমন বেঁচে রয়েছি। "

নর্তনের কথায় মাথা নাড়ল ভিজে, বলল, "ও-কথা বলে কোনও লাভ নেই, বাপু ! মনে রেখো, আমরা ষোলোশো বছর পিছিয়ে যাচ্ছি। এবং যে কালে গিয়ে আমরা হাজির হব, সেটা কালিদাসেরই কাল। তুমি যদি গিয়ে বলো, আপনি তো মশাই নামেই আছেন, আমরা আছি বেঁচে, তিনি মাথা নেড়ে বলবেন, না, বাপু, আমি নামে তো আছিই, শরীরেও আছি। বরং, তোমরাই নেই। আসলে, তোমরা এখনও হওইনি ! তোমাদের জন্ম নিতে এখনও ষোলোশো বছর বাকি !"

ভিজের কথায় হেসে উঠল সবাই। সলিল বলল, "সে তো বুঝলাম ! কিন্তু, কালিদাসের সঙ্গে দেখা হলে কথা বলব কীভাবে ?"

"কেন ? তাতে অসুবিধেটা কোথায় ?" জিজ্ঞেস করল নর্তন।

"আমরা কথা বলি বিশ শতকের বাংলা ভাষায়," সলিল বলল, "ওদিকে, কালিদাসের ভাষা হয়তো ষোলোশো বছর আগেকার সংস্কৃত ! আমরা সকলেই তো সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত। "

"নো প্রবলেম," বলল মরগোশ, "আমার এই যন্ত্রটা শুধু যে রিমোট

কন্ট্রোল, তা নয়, আসলে এটা একটা 'মালটিপারপাস মেশিন'। এদিককার এই সবুজ বোতামটা এক ধরনের 'গ্রিন সিগনাল'। এটা টিপলে, যে ভাষাতেই কথা বলা হোক না কেন, সেটা সঙ্গে সঙ্গে অন্য ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা আছে। ওই বোতামের পাশেই এই যে দুটো বোতাম রয়েছে পরপর, সবুজের পর ওর প্রথমটাকে টিপলে আমাদের ভাষা অনুবাদ হয়ে যাবে, যার সঙ্গে কথা বলছি, তার ভাষায়, এবং তার পরের বোতামটা টিপলে, সেই ভাষাটা অনুবাদ হবে আমাদের ভাষায়। "

"তবে আর ভাবনা কিসের ?" চন্দ্রবদন বলল, "চলো, তা হলে কালিদাসের কালেই যাওয়া যাক। "

"সেই কবিতাটা কি পড়েছ তোমরা," বলল সলিল, "যার মাঝখানের দুটো লাইন হল :

ষোলোশো বছর আগে কালিদাস খেত কী ?
রাস্তার মোড়ে মোড়ে তেলেভাজা পেত কি ?"

"ঠিক, ঠিক, কালিদাসের সঙ্গে দেখা হলে," বলল ভিজে, "তেলেভাজার খবরটাও জেনে আসতে হবে !"

ভিজের কথায় মরগোশ হাসল, তারপর যন্ত্রটার গায়ে একটা বোতাম টিপে ধরল, কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে ওরা পৌঁছে গেল কালিদাসের কালে। দেখা গেল, এবার ওরা সবাই দাঁড়িয়ে আছে একটা প্রশস্ত রাজপথের একধারে। রাজপথ ধরে এগিয়ে চলেছে বিরাট এক হাতি। অঙ্কুশ হাতে মাহুত ছাড়াও, হাতির পিঠে রংবেরঙের পোশাক পরা আরও অনেক মানুষ। হাতি সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এবং তার বিরাট ছায়াটাও এগিয়ে চলেছে হাতির পেছন-পেছন, বাধ্য অনুচরের মতো। হাতি যত এগোচ্ছে, ছায়াও তত এগোচ্ছে, হাতি যখন থামছে, ছায়াও থেমে পড়ছে সঙ্গে সঙ্গে।

"বেচারা হাতি ছায়াটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে," বলল নর্তন।

"এই প্রচণ্ড গরমে ছায়াটাকে টানতে রীতিমত গলদঘর্ম হতে হচ্ছে হাতিটার," বলল মরগোশ, "তাই বোধ হয় হাতির গতি এমন মন্থর !"

ইমামি ওপাশ থেকে বলে উঠল, "তা নয় রে, তা নয় ! আসলে, হাতি চেষ্টা করছে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে, কিন্তু ছায়াই ওকে টেনে রেখেছে পেছন দিকে। হাতির গতি তাই এমন মন্থর !"

ইমামির কথার পিঠে কী যেন বলতে যাচ্ছিল মরগোশ, এমন সময় দূর থেকে প্রচণ্ড চেঁচামেচির আওয়াজ কানে এল ওদের। তর্ক তুলে সবাই সেইদিকে ফিরল। দেখল, একটি লোককে পিছমোড়া করে বেঁধে একদল মানুষ এগিয়ে আসছে সামনের দিকে।

সলিল মরগোশের দিকে ফিরে বলল, "ব্যাপারটা কী, জানা দরকার !"

মরগোশ সলিলের হাতে যন্ত্রটা তুলে দিতে দিতে বলল, "কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও। কিন্তু, সাবধান, গতবারের মতো, নিজে যেন জড়িয়ে পোড়ো না আবার। তা হলে সব মাটি হবে। "

যন্ত্রের সাহায্যে রাস্তার মানুষের চোখে আবার দৃশ্যমান হল সলিল, তারপর একজনকে জিজ্ঞেস করল, "ওরা লোকটাকে নিয়ে কোথায় চলেছে, ভাই ?"

ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও যন্ত্রের কল্যাণে একবারেই সলিলের কথা বুঝতে পারল লোকটি, সলিলের বেশভূষার দিকে চেয়ে দেখল কয়েকবার, তারপর ভুরু কুঁচকে বলে উঠল, "তুমি কোত্থেকে আসছ ?"

"আমি বিদেশি," বলল সলিল। তারপর আঙুল তুলে লোকটিকে দেখিয়ে আবার বলল, "ওই লোকটার কী ব্যাপার, তুমি কিছু জানো ?"

সেকালে সবসময়ই নানা ধরনের বিদেশি মানুষের আনাগোনা হত ভারতে। স্থানীয় লোকটিও সলিলের বাসস্থান সম্পর্কে আর আগ্রহ প্রকাশ করল না। আসামির দিকে আঙুল তুলে বলল, "ওকে ওরা বধ্যভূমিতে নিয়ে চলেছে। "

"বধ্যভূমি ?" সলিল হকচকিয়ে গেল এবার, "কেন ? লোকটাকে কি ওরা মেরে ফেলবে নাকি ?"

"তা-ই তো শুনলাম। " বলল লোকটি, "জানা গেছে, ও মোট তিনবার লোকের বাড়ি থেকে চুরি করেছে। এদেশের নিয়ম হল, প্রথমবার চুরির শাস্তি হিসেবে বাঁ হাত কেটে দেওয়া হয়, দ্বিতীয়বারে ডান হাত, এবং তৃতীয় বারে প্রাণদণ্ড। "

"কিন্তু, লোকটার দু'খানা হাতই তো রয়েছে দেখছি !" সলিল অবাক হয়ে বলল।

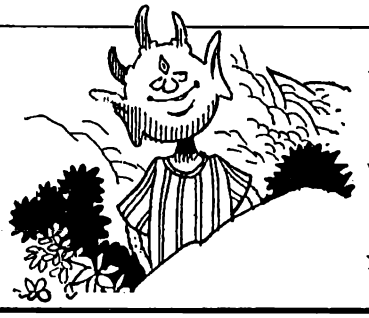

ফুটপাথ ধরে কিছুদূর যেতেই দেখা গেল, একটা ঘোড়ার গাড়ি ধীর গতিতে চলে গেল ওদের পাশ দিয়ে। গাড়ির মাথার ওপর বসে রয়েছে চালক, সে ঘোড়ার গায়ে ছড়ি চালাচ্ছে মাঝে-মাঝে। গাড়ির দরজা বন্ধ রয়েছে বলে ভেতরের যাত্রীদের কাউকেই দেখতে পাওয়া গেল না। একটু বাদে ঘোড়ার গাড়ির পাশ দিয়ে একটা মোটরগাড়ি বেরিয়ে গেল সাঁ করে, হর্ন বাজিয়ে পোঁ পোঁ আওয়াজ করতে করতে।

"তার কারণ, চুরি করেও লোকটা আগের দু'বার ধরা পড়েনি। যখন ধরা পড়েছে, তখন জানা গেছে, ওর চুরির সংখ্যা অন্তত তিন। "

"বধ্যভূমি এখান থেকে কতদূর ?" জিজ্ঞেস করল সলিল।

"তা, কম করেও আড়াই ক্রোশ হবে। হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে লোকটি বলল, "এই প্রচণ্ড গরমে আড়াই ক্রোশ পথ হাঁটা চাট্টিখানি কথা নয়। "

সলিল মনে-মনে হিসেব করল, এক ক্রোশ হল দু' মাইল, তা হলে আড়াই ক্রোশ হবে, আড়াই দু' গুণে পাঁচ মাইল। আবার, এক মাইল=১.৬ কিলোমিটার ধরলে, পাঁচ মাইল=৫×১.৬=৮ কিলোমিটার। যা গরম পড়েছে, তাতে আট কিলোমিটার পথ হাঁটতে যে-কোনও লোকেরই নাভিশ্বাস উঠবে।

হঠাৎ আসামিকে বলতে শোনা গেল, "তোমরা কীভাবে আমাকে শাস্তি দিতে চাও ? গলা কেটে ?"

সলিল তাড়াতাড়ি মেশিনটা ওদের দিকে এগিয়ে ধরল, যাতে ওদের কথাবার্তা ভালভাবে শোনা যায় !

ঘাতকদের যে নেতা, সে একবার ভুরু কুঁচকে চেয়ে দেখল আসামির দিকে, তারপর বলল, "হ্যাঁ ! সেইরকমই তো আদেশ হয়েছে !"

আসামি চেঁচিয়ে উঠল, "তা হলে শাস্তিটা এক্ষুনি দিয়ে দাও, বাপু ! এই প্রচণ্ড গরমে কেন আমাকে মিছিমিছি আড়াই ক্রোশ পথ হাঁটিয়ে কষ্ট দিচ্ছ ?"

"বাপু, আমি হলাম হুকুমের চাকর।" বলল ঘাতকদের নেতা। "আমার ওপর আদেশ হয়েছে, আসামিকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে শাস্তি দিতে হবে। আমি তো তার অন্যথা করতে পারব না।"

"তোমাদের ওই ফালতু নিয়ম আমি মানি না।" চেঁচিয়ে উঠল আসামি, "আমাকে এখানেই শাস্তিটা দিয়ে দাও, ল্যাটা চুকে যাক!"

"মাথা গরম কোরো না বাপু, তোমাকে অনেক রকম সুবিধে দেওয়া হচ্ছে।" কপালের ঘাম মুছে লোকটি বলল, "মনে রেখো; বধ্যভূমিতে একবার পৌঁছতে পারলেই তুমি খালাস। আমাদের কষ্টটা একবার ভাবো দেখি, এই পুরো রাস্তাটা আমাদের এই গরমের মধ্যেই আবার হেঁটে ফিরে আসতে হবে।"

"তাই তো? তোমাদের খাটনি যে আমার চেয়েও বেশি, তা তো আমার খেয়াল ছিল না।" আসামির গলার স্বরে শ্লেষ।

"শুধু তা-ই নয়। তোমাকে অন্যভাবেও দয়া করা হচ্ছে। মনে রেখো, প্রথম দুটো শাস্তি থেকে তোমাকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। তোমার হাত দুটো আমরা বাঁচিয়ে দিয়েছি। শুধু গলা কেটেই তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।"

"অত দয়া না দেখালেও চলবে," বলল আসামি।

"গলা কাটার পর হাত দুটোও কেটে দিয়ো তোমরা, আমি আপত্তি জানাতে আসব না।"

"আর যদি গলার আগেই হাত কাটা হয়?" ভুরু কুঁচকে বলল ঘাতকদের নেতা।

"না, না, তা চলবে না।" প্রবল আপত্তি জানাল আসামি, "মনে রেখো, ধর্মাবতারের আদেশ, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামির শেষ ইচ্ছে পালন করতে তোমরা বাধ্য।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি চিন্তা কোরো না।" ঘাতকদের নেতাকে বলতে শোনা গেল, "বধ্যভূমিতে পৌঁছে শুধু গলা কেটেই তোমাকে ছেড়ে দেব। তোমার হাতের দিকে আমরা হাত বাড়াব না।"

নর্তন সলিলের দিকে ফিরে বলল, "এইসব বেয়াড়া শাস্তি আমার একটুও ভাল লাগে না। চলো, অন্য কোথাও যাই।"

"ঠিক বলেছ," বলল ইমামি, "ওদের সঙ্গে-সঙ্গে এগনোর কোনও মানে হয় না।"

"এবার তা হলে তোমরা কোন যুগে যেতে চাও?" সকলের দিকে ফিরে চাইল স্বরগোশ।

"বাঃ, এক্ষুনি কেন? কালিদাসের সঙ্গেই তো দেখা হয়নি এখনও," বলল সলিল, "সেইজন্যেই তো আমরা ষোলোশো বছর পিছিয়ে এলাম, তাই না?"

"তা-ও তো বটে!" বলল স্বরগোশ, "তা হলে কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও, কোথায় গেলে কালিদাসের দেখা মিলবে?"

কথা বলতে-বলতে সকলে দাঁড়িয়ে পড়েছিল পথের ওপর। ঘাতকের দলকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। তারা বোধ হয় আসামিকে নিয়ে অন্য কোনও পথ ধরে বধ্যভূমির দিকে চলে গেছে। পথের একটি লোককে কালিদাসের ঠিকানা জিজ্ঞেস করল সলিল। এবারও যোগাযোগে কোনও বিঘ্ন হল না। লোকটি কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল সলিলের দিকে। তারপর বলল, "তুমি কোন দেশের মানুষ, বাপু? তুমি কি শক?"

'শক' কথাটা সলিলের অজানা নয়। ও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পড়েছে, 'শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন'। শকদের সঙ্গে বহুবার যুদ্ধ করেছিলেন বলে রাজা বিক্রমাদিত্যকে যে 'শকারি' বলা হত, সে-কথাও মনে পড়ল সলিলের। কিন্তু, ও নিজে শক না হুন না কুষাণ না অন্য কিছু, তা ওর জানা নেই। প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে সলিল পালটা প্রশ্ন করল লোকটিকে, "তুমি কি কালিদাসের নাম শুনেছ?"

লোকটি সলিলের দিকে অবাক চোখ তুলে চেয়ে দেখল আর একবার, তারপর হেসে বলল, "বাপু, কবি কালিদাসের নাম জানে না, এমন মানুষ এদেশে নেই!"

"তবে?" সলিল জিজ্ঞেস করল।

"তবে আবার কী?" বলল লোকটি, "কালিদাস যে অবন্তীর মানুষ, তা কি তুমি জানো?"

"হ্যাঁ, তা-ই তো শুনেছি," বলল সলিল।

"আমরা অবন্তী থেকে কতদূরে আছি, তা তোমার খেয়াল আছে?" লোকটির মুখে বাঁকা হাসি!

এতক্ষণে ব্যাপারটা সলিলের বোধগম্য হল। সলিলরা যেখানে রয়েছে, বিংশ শতাব্দীতে সে জায়গাটা হল পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ওদিকে, কালিদাসের বাসস্থান অবন্তীর অবস্থান হল পশ্চিম ভারতে। দুটো জায়গার মধ্যে দূরত্ব কতখানি, কে জানে? বোধ হয় তেরো- চোদ্দশো কিলোমিটার! মরগোশের যন্ত্রের সাহায্যে ওরা সময়ের হেরফের করতে পারছে বটে, কিন্তু, স্থানের হেরফের করার কোনও চেষ্টা তো করা হয়নি এখনও! সলিল লোকটির দিকে চেয়ে হেসে ফেলল এবার, তারপর স্যালুট করার ভঙ্গিতে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, "টা—টা, বাই—বাই!" তারপর যন্ত্রের বোতাম টিপে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকটা হকচকিয়ে গিয়ে নিজের চারপাশে সলিলকে খুঁজল একটুকাল, তারপর "ওরে বাবা রে!" বলে চেঁচিয়ে উঠে একদিকে ছুটতে আরম্ভ করল।

॥ ৫ ॥

সলিল বলল, "তা হলে?"

মরগোশ একটু অপ্রস্তুত হল, তারপর বলল, "যন্ত্রের সাহায্যে কালের হেরফের করার নিয়মটা জানি, এবং কয়েকবার ব্যবহারও করেছি। কিন্তু স্থান পালটানোর যে দরকার হতে পারে, আমার মাথায় আসেনি একবারও। আমি যদি তোমাদের মতো মানুষ হতাম, তবে হয়তো সেটা আমার মাথায় আসত। ওটা যে জানতাম না, তা নয়, কিন্তু, একেবারে ভুলে মেরে দিয়েছি। এই ষাট-সত্তরখানা বোতামের মধ্যে কোনটার পর কোনটা টিপলে যে স্থানের হেরফের করা যাবে, কোনও দিন ব্যবহার না করার ফলে, সেটা মন থেকে একেবারে মুছে গেছে।"

"এবার তবে কোনদিকে?" জিজ্ঞেস করল ভিজে।

মরগোশ ভিজের কথার উত্তর দিল না, নিজের কথার জের টেনে বলতে লাগল, "তা ছাড়া কালের হেরফের করার নিয়মটা অনেক সরল, কালের গতির মোটে দু'টো দিক, অতীত এবং ভবিষ্যৎ। তুমি যেদিকে যেতে চাও, সেটা বেছে নিলেই হল। শুধু স্পিডোমিটারের দিকে একটু নজর রাখতে হয়। কিন্তু, স্থানের ব্যাপারটা অনেক বেশি গোলমেলে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম—দিক তো মোটে এই চারটেই নয়। ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈর্ঋত আছে। শুধু তা-ও নয়, তাদের ভেতরে-ভেতরেও আরও অসংখ্য দিক আছে। একে তো দিক নির্বাচনের ব্যাপারটা অনেক বেশি জটিল, তাতে আবার কোনও দিন ব্যবহার করিনি। ফলে, পুরো ব্যাপারটা একদম ভুলে বসে আছি।"

"মহাভারতের যুগেও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, সেটাও তবে এ-যাত্রা বাদ দেওয়া যাক, কী বলো?" বলল নর্তন।

"বাদ দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই, ভাই," লজ্জিত মরগোশ কবুল করল, "মহাভারতের যুগে যেতে পারি, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের থেকে কত দূরে থাকব জানি না। সেখানে গিয়ে যদি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই না দেখতে পাই,

তবে গিয়ে লাভ কী ? পরের বার আমরা যখন আবার জাম্বো ডিমের অন্দরে ঢুকব, তখন স্থান নির্বাচনের নিয়মটাকেও একটু ঝালিয়ে আসতে হবে।"

"তা হলে চলো," বলল সলিল, "একেবারে নিয়ানডারথালদের যুগেই যাওয়া যাক। মাঝখানে আর থেমে কাজ নেই !"

"তার মানে, কত বছর আগে ?" জিজ্ঞেস করল মরগোশ।

"চল্লিশ হাজার তো বটেই," বলল সলিল, "আশি হাজারও হতে পারে।"

"চল্লিশ আর আশির মধ্যে অনেক ফারাক, বাপু। ঠিক করে বলো, কোনটা চাও ? চল্লিশ, না আশি ? না, আর কিছু ?" মরগোশ মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করল।

"চল্লিশ আর আশির মাঝামাঝি রফা করো তা হলে," হেসে বলল সলিল, "চলো, ষাট হাজার বছর পিছিয়ে যাওয়া যাক।"

"ঠিক আছে," বলে স্পিডোমিটারটা অ্যাডজাস্ট করে নিল মরগোশ, তারপর অতীতের বোতামটাকে টিপে ধরল একটুকাল। প্রায় দু'মিনিট বাদে ওরা পৌঁছে গেল ষাট হাজার বছর আগেকার যুগে।

ওরা যেখানে এসে হাজির হল, সেটা বিরাট একটা মাঠ। মাঠে প্রচুর লম্বা লম্বা ঘাস, আশপাশে বুনো ঝোপ। দেখা গেল, নেংটি পরা একটা মানুষ একটা বুনো ছাগলের পেছনে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। হাতে ছোরাজাতীয় পাথরের একটা অস্ত্র। কোথাও কোনও বাড়িঘরের চিহ্ন মাত্র নেই।

ওরা সবাই একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল মানুষটা বেশি লম্বা নয়। শরীর আন্দাজে মাথাটা অনেক বড়, মুখের নীচের দিকটা বানরের মতো এগিয়ে রয়েছে সামনের দিকে। এবং, গায়ে, বানরের মতো অত বেশি না হলেও, যথেষ্ট লোম।

উত্তেজিত সলিল চেঁচিয়ে উঠল, "নিয়ানডারথাল মানুষ !"

ভিজে বলল, "নিয়ানডারথালদের চালচলন আমরা কিছু জানি না। ওরা হল আদিম মানুষ। সুতরাং, আমাদের খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।"

সবাই ঘাড় নাড়ল ভিজের কথায়।

ওরা অবশ্য আদিম লোকটার কাছে তখনও অদৃশ্য হয়েই রয়েছে। সুতরাং আপাতত ভয়ের কোনও কারণ নেই। কিন্তু যদি অদৃশ্য হয়েই থাকতে হয়, এবং শেষপর্যন্ত অদৃশ্য হয়েই চলে যেতে হয়, তবে এত যুগ পিছিয়ে এসে লাভ কী ? ঠিক হল, লোকটার চালচলন কিছুক্ষণ লক্ষ করা হবে, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বুনো ছাগলটা ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। শিকার হাতছাড়া হল দেখে, ব্যর্থমনোরথ হয়ে মাটির ওপর বসে পড়ল লোকটা। ওরা সবাই এগিয়ে গিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়াল। দেখল, লোকটার কাছাকাছি একটা জায়গায় মাটিতে গাঁথা রয়েছে সমতল একটা ফলক। দেখতে অনেকটা স্লেটের মতো। তফাত হল, স্লেটকে নড়ানো যায়, এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে নিয়েও যাওয়া যায়। কিন্তু, ফলকটা মাটিতে একেবারে গাঁথা। আরও দেখা গেল, এবড়ো-খেবড়ো চেহারার খড়ির মতো কী একটা পড়ে রয়েছে ফলকের ওপর।

ভিজে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "কী আশ্চর্য ! মনে হচ্ছে, ওরা লিখতে জানে !"

"কীভাবে জানলে ?" জিজ্ঞেস করল চন্দ্রবদন।

"বুঝতে পারছ না ?" চেঁচিয়ে উঠল ভিজে, "মাটিতে গাঁথা ওই পাথরের ফলকটা হল ওদের ব্ল্যাকবোর্ড, যে চক দিয়ে ওরা লেখে, সেটা তো ফলকের ওপরই রয়েছে !"

সকলেই ভিজের কথায় ঘাড় নাড়ল। লোকটা এগিয়ে গিয়ে ফলকটার পাশে গিয়ে বসল। তারপর চক হাতে নিয়ে ফলকের ওপর কী যেন লিখল। ওরা সামনে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, ফলকের ওপর বড়সড় একটা ত্রিভুজ আঁকা রয়েছে। তার একপাশে ওপরে-নীচে দুটো সমান্তরাল রেখা, অন্য পাশে আরও দুটো সমান্তরাল রেখা আঁকা রয়েছে পাশাপাশি।

সলিল বলল, "যদিও আলাদা আলাদা ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে হরফের প্রচলন হয়েছে মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে, কিন্তু হরফের একেবারে আদিম রূপ হয়তো শুরু হয়েছিল এইসব যুগেই !"

নর্তন বলল, "এমনও হতে পারে, মোটে ওই তিনটে হরফই ওদের সম্বল !"

ভিজে মাথা নাড়ল, তারপর বলল, "আমার মনে হচ্ছে, লোকটা কিছু একটা লিখেছে ফলকের ওপর। তা যদি হয়, তবে বলতে হবে, ওদের প্রকাশভঙ্গি খুবই সরল। এবং অক্ষরগুলোর মধ্যেও জটিলতা নেই।"

"হতে পারে, হতে পারে !" হাত ঘষতে ঘষতে বলল সলিল, "আবার এ-ও হতে পারে, ওগুলো কোনও অক্ষরই নয়, কয়েকটা অর্থহীন আঁকিবুকি মাত্র।"

হঠাৎ ঝোপটার দিক থেকে মরগোশের অস্ফুট একটা আওয়াজ কানে এল ওদের। ওরা তড়িৎস্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে উঠে ফিরে চাইল মরগোশের দিকে। দেখল, রিমোট কন্ট্রোল হাতে নিয়ে মাটির দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে সে ! ওর চেহারা দেখে মনে হল, অস্বাভাবিক কিছু একটা দেখে, ও একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে !

সব ক'জন একই সঙ্গে ছুটল মরগোশের দিকে। গিয়ে দ্যাখে, এ কী ? মাটিতে পড়ে আছে অন্য একটা রিমোট কন্ট্রোল ! ওরা মরগোশের ডান হাতের দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখল আবার। ওর রিমোট কন্ট্রোল ওর হাতেই ধরা রয়েছে। তা হলে, এই নতুন রিমোট কন্ট্রোলটা এল কোত্থেকে ?

"তো-তো-তোমার কাছে তো একটাই মোটে ছিল, তাই না ?" স্খলিতস্বরে বলে উঠল সলিল।

"হুঁ," মরগোশ অন্যমনস্ক ভাবে ঘাড় নাড়ল। ওর মুখ থেকে তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি।

"তবে ? তবে এটা এল কোত্থেকে ?" বলে উঠল নর্তন।

কেউ উত্তর দিল না। কীভাবে উত্তর দেবে ? উত্তর জানলে তো দেবে !

এমন সময় দেখা গেল, নিয়ানডারথাল মানুষটি পাথরের ফলক ছেড়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে ধীরে-ধীরে। বলা বাহুল্য, ওরা সকলে লোকটির কাছে তখনও অদৃশ্য হয়েই আছে। সুতরাং, ভয়ের কিছু নেই। লোকটি সোজা এগিয়ে গেল যন্ত্রটার দিকে। তারপর মাটি থেকে তুলে নিল যন্ত্রটা। নর্তন চেঁচিয়ে উঠল, "কী আশ্চর্য ! এই যন্ত্রটা ওর ?" সলিল আর থাকতে পারল না, মরগোশের দিকে ফিরে বলল, "তোমার যন্ত্রটা দাও, আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই !"

যন্ত্রটা সলিলের দিকে এগিয়ে দিতে-দিতে মরগোশ বলল, "সাবধান !"

সলিল ঘাড় নাড়ল, তারপর যন্ত্রের বোতাম টিপে লোকটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল !

এক মুহূর্তের জন্যে হকচকিয়ে গেল লোকটি, তারপর বোধ হয় কিশোর বয়েসের একটি ছেলেকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কতকটা নিশ্চিত হল। সামনে এগিয়ে এসে সলিলের হাতের যন্ত্রটার দিকে চেয়ে দেখল একবার, তারপর নিজের হাতের যন্ত্রটার দিকে চোখ ফেরাল। ওর চোখের বিস্মিত দৃষ্টি বারকয়েক দ্রুত ঘুরে গেল এ-যন্ত্র থেকে ওটায়, আবার ওটা থেকে এটায়। একটু বাদে ওর মুখে ফুটে উঠল নিঃশব্দ হাসি।

যন্ত্রের বোতাম টিপে, সলিল বলল, "তুমি কে ?"

লোকটা হাঁ করে ফিরে চাইল সলিলের মুখের দিকে, কোনও উত্তর দিল না। হাত বাড়িয়ে সলিলের জামাটা একবার স্পর্শ করল সন্তর্পণে, তারপর সলিলের হাতের রিমোট কন্ট্রোলের ওপর আলতো করে নিজের ডান হাতের তর্জনীটা ঠেকাল। ওর মুখে আবার ফুটে উঠল নিঃশব্দ হাসি।

সলিল অধৈর্য হয়ে আবার বলল, "তোমার নাম কী ?"

লোকটা আবার সলিলের মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু কাল, তারপর দু'দিকে মাথা নেড়ে বলে উঠল, "অং বং চং।"

ওরা বুঝল, লোকটা কথা বলতে পারে। কিন্তু, সে-ভাষা বোঝার সাধ্য ওদের নেই। সকলেই এবার একে একে যন্ত্রের সাহায্যে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ওর চোখের সামনে। নিয়ানডারথাল মানুষটি এই আজব কাণ্ড দেখতে লাগল দু'চোখ বড় করে। তারপর বলে উঠল, "কিং কং !"

ভিজে মাথা নেড়ে বলল, "উঁ হুঁ ! তুমি বাপু ভুল বলছ ! 'কিং কং' হল পেল্লায় চেহারার এক কাল্পনিক গোরিলা। তুমি তো বাপু গোরিলাও নও, কাল্পনিকও নও !"

সলিল অস্থির হয়ে বলল, "ও কথা বলছে ! অথচ, আমরা বুঝতে পারছি না। আমরাও ভাষা জানি না, ও-ও আমাদের ভাষা জানে না। যন্ত্রটা আমার হাতে কাজ করছে না। ওর সঙ্গে ভাববিনিময় করব কীভাবে ?"

"দাঁড়াও, দেখছি !" বলে মরগোশ এগিয়ে গেল লোকটির কাছে। তারপর ওর কাছ থেকে রিমোট কন্ট্রোলটা চাইল ইশারায়। লোকটা একটু অবাক হল, কিন্তু বিনা প্রতিবাদে সে যন্ত্রটা তুলে দিল মরগোশের হাতে।

মরগোশ যন্ত্রটা পরীক্ষা করে বলল, "যন্ত্রটা চালু নেই !" একটা বোতাম টিপে যন্ত্রটাকে চালিয়ে দিল মরগোশ। তারপর এগিয়ে গিয়ে লোকটির ডান হাতের তর্জনীটা যন্ত্রের একটা বিশেষ বোতামের সঙ্গে ঠেকিয়ে দিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী ?"

লোকটি কোনও উত্তর দিল না, শুধু হাঁ করে চেয়ে রইল মরগোশের দিকে। সলিল বলল, "তুমি কী করতে চাইছ ?"

"ওকে দিয়ে কথা বলানোর চেষ্টা করছি আমি," বলল মরগোশ, "কিন্তু, ওর ভাষা একেবারে ঐতিহাসিক তো, তা-ই বোধ হয় অসুবিধে হচ্ছে। আমি আশা করছি, ও আমাদের ভাষা ঠিকই বুঝতে পারবে, ওর ভাষাও বুঝতে পারব আমরা। যন্ত্র যখন দু'টো, তখন, মনে হচ্ছে, কাজটা তেমন কঠিন হবে না।"

সবাই ঘাড় নাড়ল। লোকটির চেহারা দেখে মনে হল, সে বিশেষ কিছু বুঝছে না, কিন্তু পুরো ব্যাপারটায় বেশ কৌতুক অনুভব করছে। মরগোশের চেষ্টা প্রথম কয়েকবার বিফল হল বটে, কিন্তু শেষপর্যন্ত কাজ হল।

মরগোশ যখন পঞ্চমবার জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী ?" লোকটির চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় দেখতে পাওয়া গেল, সে উত্তর করল "ওরাং !"

এবার আর অং বং চং বা কিং কং নয়, এবার মনে হল, সত্যিই ও ওর নামই বলেছে। ওরা বুঝল, ওর নাম ওরাং। ওর মুখ দেখেও বোঝা গেল, ও বুঝেই উত্তর করেছে। নর্তন চেঁচিয়ে উঠল, "ও কথা বলেছে, ও কথা বলেছে !" সবাই উত্তেজনায় লাফালাফি শুরু করে দিল। লোকটাও হাসিমুখে একবার এর দিকে, আর একবার ওর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। ওর মুখ দেখে মনে হল, পরিস্থিতিটা ও বেশ উপভোগ করছে।

মরগোশ বলল, "তোমার নাম ওরাং তো !"

"হ্যাঁ," লোকটির উত্তর।

আর সন্দেহ নেই ! সত্যিই লোকটি কথা বলেছে। ওরা সবাই আবার হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল।

বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর অনেক খবরই জানা গেল নিয়ানডারথালদের সম্পর্কে। বোঝা গেল, ওদের ভাষাতে বিশেষ কোনও জটিলতা নেই। প্রকাশভঙ্গিও সরল। দেখা গেল, যেসব জিনিস ধরাছোঁয়ার মধ্যে, তা বুঝতে ওদের অসুবিধে হয় না, কিন্তু, যা অনুভবে জানতে হয়, তা ওরা বিশেষ বোঝে না।

ওরাং-এর কাছ থেকে এক অদ্ভুত সংবাদ পাওয়া গেল। জানা গেল, সলিলদের আগে অন্য একদল মানুষ এসে হাজির হয়েছিল ওখানে। অল্প কিছুদিন আগে। ওদের সঙ্গে বেশ কয়েকটা রিমোট কন্ট্রোল ছিল। যেদিন ওরা এসেছিল, সেদিন একদল বুনো ভালুকও এসে পড়েছিল সেখানে। ভালুকের তাড়ায় ওরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সেই সময় ওই রিমোট কন্ট্রোলটা ওরা ফেলে যায়।

চন্দ্রবদন ভয়ে ভয়ে বলল, "মাঝে-মাঝে ভালুকের দল এসে হাজির হয় নাকি এখানে ?"

ওরাংয়ের কথা থেকে জানা গেল, কাছাকাছি ভালুকদের কয়েকটা দল আছে বটে, কিন্তু তারা মোটেই হিংস্র নয়। এর আগে কোনওদিন কাউকে ভালুকের তাড়ায় পালাতে দেখেনি ওরা। ওই দলের ছোকরারা ভালুকের আস্তানার সামনে গিয়ে বিরাট হইচই লাগিয়ে দিয়েছিল। বোধ হয়, ভালুকদের সেটা পছন্দ হয়নি !

ভালুক সম্পর্কে কতকটা নিশ্চিন্ত হল সবাই।

যন্ত্রটা হাতে নিয়ে সলিল বলল, "তোমার বাড়িতে কে-কে আছে ?"

ওরাং বলল, "আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, আমার মেয়ে।"

সলিল চেঁচিয়ে উঠল, "ঠিক আমাদের মতো। বাবা, মা, আমি আর আমার ছোট বোন টুটুন।"

ভিজেও উত্তেজিত, "আমাদেরও ঠিক তাই ! মা, বাবা, আমি আর আমার ছোট বোন RODO।"

"ওদের নাম কী ?" নর্তন জিজ্ঞেস করল ওরাংকে, যন্ত্র হাতে নিয়ে।

"আমার স্ত্রীর নাম নাব্বিনা, ছেলের নাম ওটান, মেয়ের নাম রুনা।"

"তোমার বয়েস কত ?" সলিল আবার প্রশ্ন করল যন্ত্র হাতে নিয়ে।

ওরাং এ-প্রশ্নের উত্তর দিল না। অবাক হয়ে চেয়ে রইল সলিলের মুখের দিকে।

"বয়েস কাকে বলে, তা বোধ হয় ও জানে না।" বলল চন্দ্রবদন।

"জানবে কীভাবে ?" বলল নর্তন। "ওদের তো আর ক্যালেন্ডার নেই। ৩৬৫ দিনে বা ১২ মাসে যে এক বছর হয়, সে খবর কেউ ওদের বলেও দেয়নি কখনও।"

"তুমি আমাদের তোমার বাড়িতে নিয়ে যাবে ?" বলল ইমামি।

সামনে এগিয়ে এসে ইমামির লম্বা নাকটাকে একটু নেড়ে দিল ওরাং, তারপর সকলের দিকে চেয়ে বলল, "চলো !"

একটা হাঁটাপথ ধরে ওরাং এগিয়ে গেল একদিকে। ওরা সবাই হইচই করতে করতে ওরাংয়ের পেছন পেছন গেল। সবাই লক্ষ করল, লোকেরা হেঁটে হেঁটে সরু একটা পথের মতো বানিয়ে ফেলেছে মাঠের মাঝখানে।

মাঠ পেরিয়ে আরও একটু এগিয়ে, ঝুপড়ির মতো কী যেন একটা চোখে পড়ল ওদের। ঝুপড়িটা বুনো লতাপাতা দিয়ে তৈরি। বোঝা গেল, ওই ঝুপড়িটাই হল ওরাংদের ঘর। ঘরের বাসিন্দারা সকলেই অবশ্য ঘরের বাইরে। মনে হল, বেশিরভাগ সময়। কিছু খাবারদাবার এবং নিত্যব্যবহার্য দরকারি কয়েকটা জিনিস ঘরটার মধ্যে থাকে। লোকেরা সাধারণত বাইরেই কাটায়। বিষ্টি-টিষ্টি হলে, বা বেশি ঠাণ্ডা পড়লে ঝুপড়ির ভেতর গিয়ে আশ্রয় নেয় ওরা।

ওরাংয়ের ছেলে আর মেয়ে সলিলদের চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট। ওদের সঙ্গে খুব ভাব জমে গেল সলিলদের। ভিজের লেজ দুটো ধরে

ওরা দু'জন নাচানাচি করল খানিকক্ষণ। ইমামির নাকের ওপরও আদরের আক্রমণ চালাল কয়েকবার। নর্তনের নাচ দেখে ওর মতো নাচতে চেষ্টা করল দু'জনেই। মোটের ওপর, একটা আনন্দের হাট বসে গেল ঝুপড়ির সামনে।

সলিল বলল, "খিদে পেয়েছে!"

ওরাং আঙুল দিয়ে দূরের একটা গাছকে দেখিয়ে দিল। ওরা একটু অবাক হল। খাওয়ার সঙ্গে গাছের সম্পর্ক কী? সবাই ধীর পায়ে এগিয়ে গেল গাছটার দিকে। কী আশ্চর্য! একটা আমগাছ! গাছের আকৃতি বিরাট, পাতার চেহারা অনেকটা আমপাতার মতো। অবশ্য, আমগাছের সঙ্গে পার্থক্যও যে আছে, তাও বোঝা যায়। রুনা আর ওটান ছুটে গিয়ে ঝুপড়ির ভেতর থেকে একটা আঁকশি নিয়ে এল। ফল পাড়া হল বেশ কয়েকটা। চেহারা এবং স্বাদ অনেকটা আমের মতো, কিন্তু আম নয়।

মরগোশ বলল, "প্রায়াম!"

নর্তন ভুরু কুঁচকে বলল, "প্রায়াম আবার কী?"

মরগোশ হাসল, বলল, "প্রায় প্লাস আম। সন্ধি করলে, 'প্রায়াম'।"

"প্রায়াম হল আমের পূর্বপুরুষ," বলল সলিল।

"ঠিক, ঠিক," বলল ভিজে, "ষাট হাজার বছর আগেকার পূর্বপুরুষ।"

"এই নিয়ানডারথালরা যেমন আমাদের ষাট হাজার বছর আগেকার পূর্বপুরুষ," বলল সলিল।

সবাই ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানাল সলিলকে।

"কিন্তু প্রায়াম খেলে তো আমার চলবে না ভাই," করুণ সুরে বলল ভিজে, "তোমরা তো জানোই, আমি ভেজিটারিয়ান নই, আমি হলাম মাংসাশী জীব।"

"খুব চলবে বাপু," প্রায় ধমকে উঠল সলিল, "একদিন ভেজিটেবল খেলে তোমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে না। আমাদের পাড়ার অর্পণদের কুকুরটার কথা মনে আছে তো তোমার? যার নাম 'সে-আসে-ধীরে'? তুমি কি জানো, তাকে রোজ পটলভাজা দিয়ে ডাল-ভাত খাওয়ানো হয়?"

"কেন যে ওর নাম সে-আসে-ধীরে, এখন তা বুঝতে পারছি।" ভিজে বলতে লাগল, "পটল খেয়ে-খেয়ে বেচারা একেবারে নির্জীব হয়ে পড়েছে। আমাকে যদি রোজ পটল ভাজা দিয়ে ডাল-ভাত খেতে হত, তা হলে একটা মাসও কাটত না। তার আগেই নির্ঘাত আমাকে পটল তুলতে হত।"

প্রায়াম খাওয়ার পর সঙ্গীতের আসর বসল ঝুপড়ির সামনে। নাচতে-নাচতে নর্তন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইল :

'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা
মনে মনে—'

ঢোলের মতো কী যেন একটা চোখে পড়ল সলিলের, সে গানের তালে-তালে সেটাকে বাজাতে লাগল। ওরাং বাজাল হাতের বাঁশি। বাঁশিটা ভালুকের না উল্লুকের হাড় দিয়ে তৈরি, তা অবশ্য জানা গেল না। কিন্তু, ওরা অবাক হয়ে দেখল, গানের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দিব্যি হাড়ের

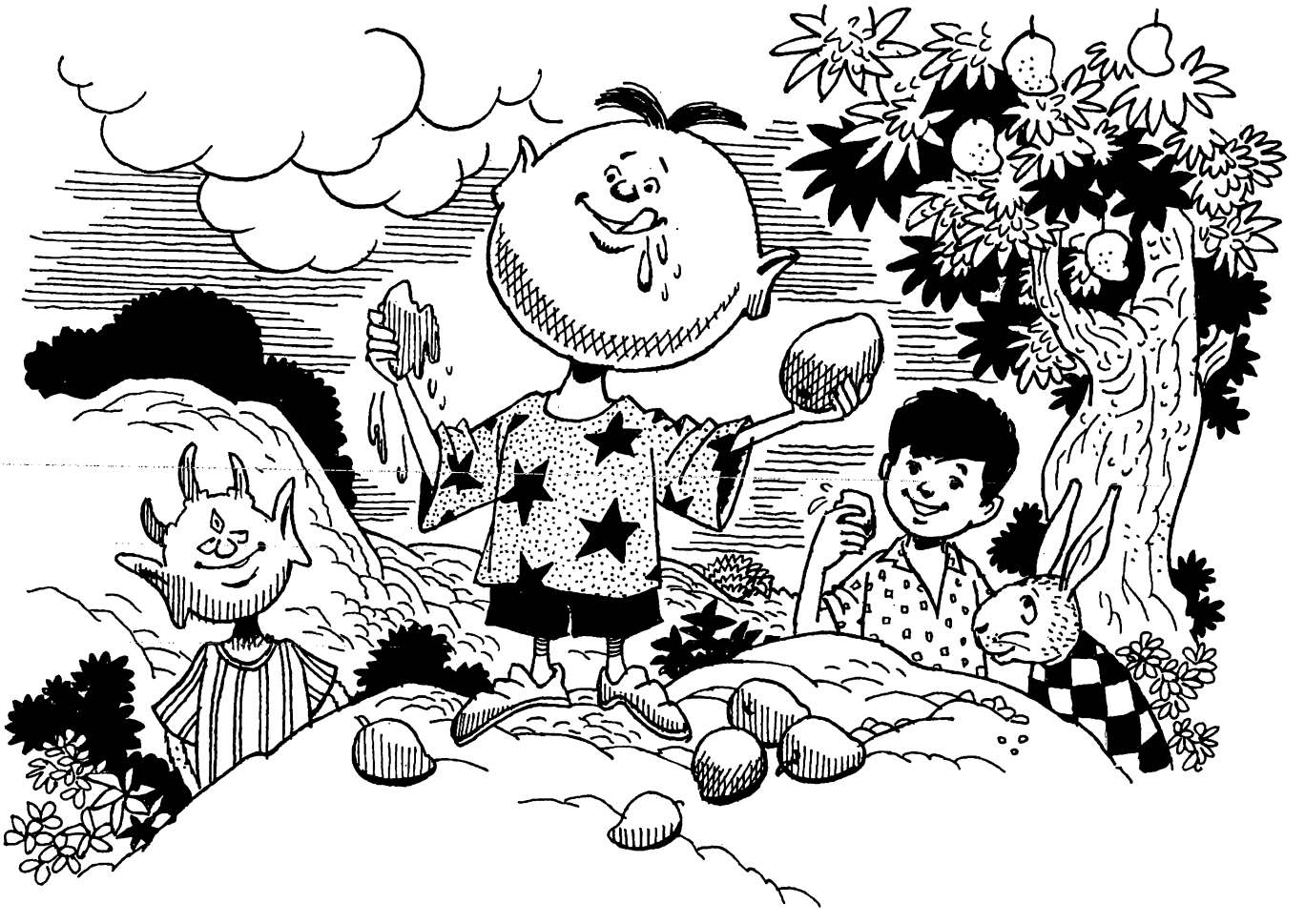

বাঁশিটা বাজিয়ে চলেছে ওরাং।

গান থামলে চন্দ্রবদন বলল, "ওরা শুধু হাড়ের বাঁশিই বাজায় কেন ? বাঁশের বাঁশি বাজাতে পারে না ?"

"বাঁশ কোথায় এখানে ?" বলল মরগোশ, "মনে রেখো, আমরা ষাট হাজার বছর পিছিয়ে এসেছি। মনে হয়, বাঁশের জন্ম হয়েছে আরও অনেকদিন বাদে। "

যখন যাওয়ার সময় হল, সকলের মনই বিষণ্ণ হল। দুঃখ তো হবেই, তবু যেতে দিতে হয়। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সলিলরা সবাই মাঠ পেরিয়ে এগিয়ে গেল অনেকটা। ওরাংরা হাত নাড়াতে লাগল দূর থেকে। সলিলরাও অনেকবার হাত নাড়াল পেছন ফিরে-ফিরে। ওদের চোখের আড়ালে গিয়ে সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল একটুকাল, তারপর ধীরে-ধীরে মরগোশ বলল, "এবার কোথায় ?"

"কোথায় আর ? একেবারে ডাইনোসরদের যুগে !" বলল সলিল।

"কিন্তু অনেক, অনেক যুগ পিছিয়ে যেতে হবে আমাদের," মরগোশ মাথা নেড়ে বলল।

"তা হোক গে !" বলল সলিল, "জুরাসিক পার্ক' সিনেমাটা দেখার পর থেকে ডাইনোসরদের সম্পর্কে আমার কৌতূহল দারুণ বেড়ে গেছে। "

"শুনেছি, জুরাসিকের মতো আরও একটা ছবি নাকি তৈরি হয়েছে কিছুদিন আগে," বলল ভিজে।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, দি লস্ট ওয়ার্ল্ড। " সলিল বলল, "কিন্তু সেসব তো ছবি, যখন জীবন্ত ডাইনোসর দেখার সুযোগ পাওয়া গেছে, তখন ছাড়ব কেন ?"

"মনে রেখো, ডাইনোসরদের যুগটা কিন্তু বেজায় লম্বা," মরগোশ বলল।

"তার মানে ?" সলিলের ভুরু কুঁচকে গেল।

"ডাইনোসররা পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করেছে প্রায় চোদ্দ-পনেরো কোটি বছর ধরে," বলতে লাগল মরগোশ, "এবং সেই সময়টাকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। এই তিনটের একেবারে গোড়ারটা শুরু হয়েছিল বাইশ-তেইশ কোটি বছর আগে। এটার নাম ট্রায়াসিক যুগ। এ-যুগের ডাইনোসররা মাপে খুব একটা বড় ছিল না। কোনও-কোনওটা লম্বায় ছিল মোটে তিন সাড়ে-তিন ফুট। দেখতে অনেকটা গিরগিটির মতো। "

"সে কী ? আমি যতদূর জানি, " মরগোশের কথার মাঝখানে বলে উঠল ভিজে, "ডাইনোসররাই হল পৃথিবীর সবচেয়ে বিরাট আকৃতির প্রাণী। তা কি তবে ঠিক নয় ?"

"কে বলেছে ঠিক নয় ?" বলল মরগোশ, "বিবর্তনের ফলে প্রথম যুগের সেই খুদে ডাইনোসররাই একদিন বিশাল আকার ধারণ করল। এবং সেটা ঘটল ডাইনোসরদের মধ্যযুগে, যেটাকে সবাই বলে জুরাসিক যুগ। "

"'জুরাসিক যুগ' থেকেই সিনেমাটার নাম বোধ হয় 'জুরাসিক পার্ক' হয়েছে, তাই না ?" বলল সলিল।

মরগোশ মাথা নাড়ল সলিলের কথায়, তারপর বলল, "জুরাসিকের পর এল ডাইনোসরদের শেষ যুগ। যার নাম ক্রেটাসিয়াস। এই যুগেই ডাইনোসরদের পতন হয়। "

"পতন মানে ?" ইমামির ভুরু কুঁচকে গেল।

"পতন মানে পতন," হাসল মরগোশ, "এবং শেষে মৃত্যু। আমাদের বিংশ শতাব্দী থেকে হিসেব করলে, প্রায় বাইশ কোটি বছর আগে ওদের আবির্ভাব ঘটেছিল পৃথিবীর বুকে, চোদ্দ-পনেরো কোটি বছর ধরে দাপটে রাজত্ব করে, প্রায় সাড়ে ছ' কোটি বছর আগে ওরা একেবারে শেষ হয়ে গেছে। "

"কীভাবে শেষ হল ওরা ?" জিজ্ঞেস করল নর্তন।

"নানা ভাবে," বলল মরগোশ, "তবে, প্রধান কারণ বোধহয় আবহাওয়ার বিপুল পরিবর্তন। পৃথিবীতে আবহাওয়ার পরিবর্তন অবশ্য প্রতিদিনই ঘটছে। ছ'-সাত কোটি বছর আগে অনেক পাহাড়-পর্বত গজিয়ে উঠেছিল পৃথিবীর বুকে। আমাদের হিমালয়ের জন্মও বোধ হয় সেই সময়। পুরনো গাছপালার বদলে একেবারে নতুন ধরনের গাছপালার আবির্ভাব ঘটেছিল। পরিবর্তন ঘটেছিল জীবজগতেও। ডাইনোসরদের শরীর ওই পুরনো পরিস্থিতিতেই অভ্যস্ত ছিল, নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে বোধ হয় খাপ খাওয়াতে পারেনি। বেশিরভাগ ডাইনোসরই সেই সময় শেষ হয়ে গেছে, কারও-কারও আবার রূপান্তর ঘটেছে। "

"রূপান্তর মানে ?" ইমামি বলল ভুরু কুঁচকে।

"রূপান্তর মানে, সত্যি সত্যি রূপান্তর। " হাসল মরগোশ, "ছিল ডাইনোসর, হয়ে গেল পাখি !"

"কী বললে ? পাখি ?" সব ক'জনই চেঁচিয়ে উঠল একই সঙ্গে।

"ঠিক তাই," মাথা নাড়ল মরগোশ। "পণ্ডিতদের তাই মত। যাই হোক, অনেক লেকচার হয়েছে, আর নয়। তোমরা এবার বলো, এই বিরাট লম্বা সময়ের মধ্যে কোনখানটা তোমাদের পছন্দ ?"

"চলো, মধ্যযুগেই যাই," বলল সলিল। "যার নাম জুরাসিক। সত্যিকারের জুরাসিক পার্কেই যাওয়া যাক। যে সময় সবচেয়ে বড় সাইজ-এর ডাইনোসরদের আবির্ভাব ঘটেছিল। "

"বেশ, বেশ," বলল মরগোশ। "আঠারো কোটি বছর আগে শুরু হয়েছিল জুরাসিক। শেষ হয়েছিল তেরো কোটি বছর আগে। এর মাঝামাঝি কোনও একটা সময় ঠিক করা যাক তা হলে !"

"ষোলো কোটি বছর আগে গেলে কেমন হয় ?" সলিলের উৎসাহই সবচেয়ে বেশি।

"মন্দ কী ?" মেশিনটা চালু করতে-করতে বলল মরগোশ। "এবারকার যাত্রা সত্যিকারের দূরপাল্লার, সুতরাং সেখানে পৌঁছতে সময় একটু বেশি লাগবে এবার। "

ওরা কেউ কিছু বলল না। মরগোশ স্পিডোমিটারের কাঁটাটা একেবারে চরমে তুলে দিল, তারপর অতীতের বোতাম টিপল। সকলে নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল জুরাসিকের প্রতীক্ষায়।

আগের কয়েকবার অতীত যাত্রার চাপটা ওরা বিশেষ অনুভব করেনি। কিন্তু এবারকার বেগ এমন প্রচণ্ড যে, মাঝে-মাঝে ওদের শরীর কাঁপতে লাগল। চোখ বন্ধ করে ষোলো কোটি বছর আগেকার যুগের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সবাই। মিনিটদশেক বাদে বোতামটা আবার টিপে ধরল মরগোশ। বিরাট নিশ্বাস ছেড়ে সবাই চোখ মেলে তাকাল এবার। পৃথিবীর মাটি আবার ওদের দৃষ্টিগোচর হল।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে সবাই দেখল, কোথাও কোনও বাড়িঘরের চিহ্নমাত্রও নেই। নিয়ানডারথালদের মতো কোনও ঝুপড়িও চোখে পড়ল না এবার। সবই কেমন যেন অচেনা-অচেনা। চারদিকে কাদা আর ঘোলা জল। তারই মধ্যে কিছু ছোট-বড় গাছ। গাছগুলোর চেহারাও একেবারে অন্য ধরনের। গোরু, ছাগল, কুকুর, বেড়াল—এইসব পরিচিত প্রাণীর একটিরও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। ঘোলা জলের মধ্যে ছোটখাটো দুটো-একটা জলীয় জীব চোখে পড়ছে মাঝে-মাঝে। কিন্তু, সেগুলোর সঙ্গেও আগে কখনও দেখাসাক্ষাৎ হয়নি ওদের। নিয়ানডারথালদের সঙ্গে যখন ওদের দেখা হয়েছিল, তখনও কোনও বাড়িঘর চোখে পড়েনি। আমের বদলে প্রায়াম খেতে হয়েছিল ওদের। কিন্তু, সেই পৃথিবীটাকে পৃথিবী বলেই মনে হয়েছিল। আদিম মানুষের সঙ্গে শেষপর্যন্ত ভাব-বিনিময়ও করতে পেরেছিল ওরা। এবার যেন পৃথিবীর আকৃতি এবং প্রকৃতি দুই-ই একেবারে বদলে গিয়েছে। আবহাওয়া উষ্ণ এবং আর্দ্র।

মাটির রং আলাদা। গাছপালার চেহারাও একেবারে অচেনা। ওদের মনে হল, ওরা বুঝি পৃথিবীতেই নেই, চাঁদ বা মঙ্গল গ্রহে গিয়ে হাজির হয়েছে।

সলিল বলে উঠল, "নিশ্বাসের জন্য বায়ুমণ্ডলে টাটকা হাওয়া রয়েছে প্রচুর। তবু কেন যেন আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে ! এ আমরা কোথায় এলাম ?"

মরগোশ বলল, "আমরা কোথাও যাইনি। এই পৃথিবীর মাটি কামড়েই পড়ে আছি। শুধু ষোলো কোটি বছর পিছিয়ে এসেছি। "

ওদের সামনে গোটাকয়েক অচেনা গাছ দাঁড়িয়ে, আকাশে অচেনা পাখি। একটা গাছের ডালে ফলও দেখতে পাওয়া গেল। কিন্তু, সে ফলের সঙ্গে ওদের চেনা কোনও ফলের মিল নেই। ফলটা না আম, না জাম, না কাঁঠাল। না অন্য কোনও চেনা ফল। ইমামি একটা ফল পেড়ে নিয়ে দাঁত দিয়ে কাটতে গেল, নর্তন তাকে বাধা দিল। বলল, "অচেনা ফলে মুখ দিয়ে কাজ নেই, বাপু। যদি বিষাক্ত হয় ?"

ইমামি ঘাড় নেড়ে বলল, "তা বটে। " তারপর ফলটাকে ছুড়ে ফেলে দিল দূরে, কাদার মধ্যে।

ভিজে বলল, "নিয়ানডারথালদের কাছে আমরা যে ফল খেয়েছিলাম, সেটাকে যদি প্রায়াম বলা যায়, এটা তবে 'আমনা'। "

সলিল কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ওদের ঠিক পেছনেই মেঘের ডাকের মতো একটা গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল। সবাই একলাফে পেছন ফিরে দাঁড়াল। বাপ রে বাপ ! এ কী ? দেখা গেল, ওদের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে তিন-চারতলা সমান উঁচু বিরাট এক জীব। তার গলা জিরাফের গলা থেকেও অনেক বেশি লম্বা। ঠিক মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে বললে অবশ্য ভুল হবে। কারণ, ওদের সকলের মুখই মাটি থেকে মোটে তিন-চার ফুট উঁচুতে, ওই বিরাট প্রাণীর মুখ মাটি থেকে অন্তত তিন-চারতলা উঁচুতে। একটু আগে যে ফলের নাম দেওয়া হয়েছিল আমনা, জীবটা এগিয়ে গিয়ে সেই ফলের গাছটাকে এক ধাক্কায় উপড়ে ফেলল। ওরা তখনও অদৃশ্য হয়েই ছিল, সকলেই একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে বাবা !"

ডালপালা সমেত পুরো গাছটাকেই খেতে লাগল সেই বিরাট জীব, ওরা চোখ বড়-বড় করে চেয়ে রইল সেদিকে। মরগোশ বলল, "আমি নানা আকৃতির ডাইনোসরের ছবি দেখেছি বইয়ে, মনে হচ্ছে, এ হল সেই 'ব্রাকিওসরাস', যার চেয়ে বড় মাপের কোনও জীবের সন্ধান বোধ হয় আজও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। "

"এ যুগের সব ডাইনোসরই এইরকম পেল্লায় নাকি রে ?" বলে উঠল নর্তন।

"কয়েক জাতের ডাইনোসরের আকৃতি খুবই বড়," বলল মরগোশ, "তবে, ব্রাকিওসরাসের চেয়ে বড় ডাইনোসর বোধ হয় আর নেই। এরই কাছাকাছি আর এক জাতের ডাইনোসরের নাম 'আপাটোসরাস'। "

ওরা হাঁটতে-হাঁটতে এগিয়ে যাচ্ছিল মাঠ ধরে। পাহাড়, সাগর, নদী, কিছুই চোখে পড়ল না কোথাও। শুধু সমতল মাঠ। এবং মাঠ ভর্তি জল আর কাদা। মনে হল, প্রচুর বৃষ্টি হয় এ-যুগে। ডাইনোসররা বোধ হয় কাদা আর ঘোলা জলের মধ্যে থাকতে ভালবাসে।

আরও কিছুদূর এগিয়ে যেতে একটা কঙ্কাল চোখে পড়ল ওদের। আস্ত একটা কঙ্কাল। বলা বাহুল্য, ছাল, চামড়া, মাংস কিছুই নেই। শুধু হাড়। চেহারা অনেকটা গিরগিটির মতো। দৈর্ঘ্য তিন ফুটের বেশি নয়। মরগোশ কিছুক্ষণ পরীক্ষা করল কঙ্কালটাকে, তারপর চেঁচিয়ে উঠল, "আমার মনে হচ্ছে, এটা হল একেবারে প্রথম যুগের ডাইনোসরের কঙ্কাল। "

"অর্থাৎ ?" চোখ কুঁচকে বলল ভিজে।

"আমরা আমাদের যুগ থেকে ইতিমধ্যে ষোলো কোটি বছর পিছিয়ে এসেছি, এরা আরও অন্তত ছ'-সাত কোটি বছর আগেকার জীব। পরবর্তী যুগে একদল মাংসাশী ডাইনোসরের দেখা পাওয়া যাবে, যাদের নাম হল 'টিরানোসরাস'। টিরানোসরাস-এর নামের সঙ্গে মিলিয়ে, এই প্রাচীনতম ডাইনোসরের নাম দেওয়া যাক 'পুরনোসরাস'।

মরগোশের কথায় সবাই হাসল। সলিল বলল, "যদি একেবারে প্রথম ডাইনোসরের নাম পুরনোসরাস হয়, তবে একেবারে শেষেরটার নাম কী হবে ?"

"ভাল প্রশ্ন করেছ," ঘাড় নেড়ে বলল মরগোশ, "তোমাদের তো আগেই বলেছি, ডাইনোসররা শেষপর্যন্ত পাখি হয়ে উড়ে গিয়েছিল। সুতরাং শেষের সেই উড়ন্ত ডাইনোসরের নাম দেওয়া যাক 'উড়নোসরাস'। "

ওদের কথা শেষ হতে না হতে সেখানে এসে হাজির হল বিচিত্র চেহারার এক ডাইনোসর। 'ব্রাকিও' বা 'আপাটো' থেকে মাপে অনেক ছোট, কিন্তু এ-ও কম নয়। বিশাল শরীর, চারটে পা, কিন্তু মাথার মাপ ছোট্ট একটা আখরোটের মতো। দৈর্ঘ্যে অন্তত আঠারো ফুট। জন্তুটার ঘাড়, পিঠ এবং লেজ সমেত সমস্ত পেছন দিকটা অসংখ্য ত্রিভুজাকৃতি ফলক দিয়ে ঢাকা। ত্রিভুজের মাথার দিকটা ছুঁচলো এবং ধারালো।

"এর নাম কী গো ?" জিজ্ঞেস করল চন্দ্রবদন।

"আমিও অনেক ছবি দেখেছি ডাইনোসরদের," বলল সলিল। "যতদূর মনে পড়ছে, এর নাম হল স্টেগোসরাস !"

"ঠিক ! ঠিক !" মরগোশ মাথা নেড়ে সলিলকে সমর্থন জানাল।

"ওর শরীরের এই ফলকগুলো একেবারে অস্ত্রের মতো, তাই না ?" জীবটার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে-থাকতে বলল ভিজে।

"ঠিকই বলেছ, ওগুলো অস্ত্রই," বলল মরগোশ। "শরীরের তুলনায় ওদের মাথা অনেক ছোট। অর্থাৎ, বুদ্ধি-টুদ্ধি বিশেষ নেই। তার মানে, প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবিলা করার সাধ্য ওদের বেশি নয়। তাই

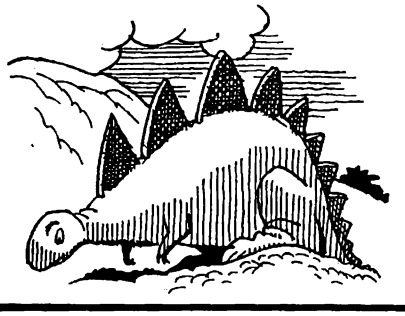

ওরাং আঙুল দিয়ে দূরের একটা গাছকে দেখিয়ে দিল। ওরা একটু অবাক হল। খাওয়ার সঙ্গে গাছের সম্পর্ক কী।? সবাই ধীর পায়ে এগিয়ে গেল গাছটার দিকে। কী আশ্চর্য ! একটা আম গাছ ! গাছের আকৃতি বিরাট, পাতার চেহারা অনেকটা আমপাতার মতো। অবশ্য, আম গাছের সঙ্গে পার্থক্যও যে আছে, তাও বোঝা যায়।

প্রকৃতিদেবী ওদের সারা শরীর অস্ত্র দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। যে ওদের আক্রমণ করবে, সে-ই মরবে। ”

“বুদ্ধি কম কি না জানি না, কিন্তু চালচলন বেশ ভাল, আমাদের দেখতে পেলে ও যে একেবারে তেড়েমেড়ে আসবে, তা কিন্তু মনে হচ্ছে না !” বলল নর্তন।

“ঠিক, ঠিক, জীবটা এমন ঠাণ্ডা যে, ওকে ‘জীব’ না বলে, ‘নির্জীব’ বললেও চলে,” বলল ভিজে।

ভিজের কথায় সকলেই হেসে উঠল।

“তা হলে আর অদৃশ্য হয়ে থাকার দরকার কী আমাদের ?” বলল নর্তন।

“মনে হয়, দরকার নেই। ” নর্তনের কথায় ঘাড় নাড়ল মরগোশ।

বিশেষ কোনও ভয়ের কারণ নেই দেখে, ওরা আবার একে-একে আত্মপ্রকাশ করল যন্ত্রের সাহায্যে। নর্তন বলল, “ষোলো কোটি বছর আগেকার এই পৃথিবীটা মোটেই সুবিধের নয়। কোথাও একটু শুকনো ডাঙা চোখে পড়ল না এখনও। সবই কেমন ভিজে আর স্যাঁতসেতে !”

“এর মধ্যে দিয়ে হাঁটাচলা করাও বেশ শক্ত,” বলল চন্দ্রবদন। “কোনও-কোনও জায়গায় ভিজে মাটিতে পা আটকে যাচ্ছে !”

ভিজে বলল, “এক কাজ করলে হয় না ? চলো, সবাই মিলে স্টেগোসরাসটার কাঁধে গিয়ে চাপি ! ও যেরকম লক্ষ্মী ছেলে, তাতে বিশেষ আপত্তি করবে বলে মনে হয় না। ”

“তার মানে ?” মরগোশের ভুরু কুঁচকে গেল।

“ওর লেজের দিকটা আমাদের সকলেরই নাগালের মধ্যে,” বলল ভিজে, “ওইদিক দিয়ে একে একে উঠে পড়া যাক ওর পিঠে। তারপর এক-একজন এক-একটা ফলক ধরে দাঁড়িয়ে পড়ব। একটু শুকনো ডাঙাও মিলবে, আবার মজাও হবে। ”

“ওরকম জ্যান্ত ডাঙায় দাঁড়াতে গিয়ে মজার বদলে আবার বিপদ না হয়,” ভুরু কুঁচকে বলল মরগোশ, “মনে রেখো, ফলকের মাথাটা ছুঁচলো এবং ধারালো। ”

“ফলকের মাথাটাকে বাঁচিয়ে দাঁড়ালেই হবে। ” ভিজে বলল, “তা ছাড়া, দাঁড়িয়েই যে থাকতে হবে, এমন কোনও কথা নেই, চেষ্টা করলে হয়তো ওর পিঠে বসাও যেতে পারে। ”

“সত্যিই তো, তা হলে মন্দ হয় না, এই প্যাচপেচে কাদার হাত থেকে একটু রেহাই পাওয়া যায়,” নর্তন বলল।

“স্টেগো ভাই, আমরা তোমার পিঠে চড়ছি একটু, তুমি কিন্তু মোটেই দুষ্টুমি করবে না,” ভিজে স্টেগোসরাস-এর মুখের দিকে চেয়ে বলল।

ভিজের কথায় সকলেই হেসে উঠল। স্টেগোসরাসও হাসল কিনা, কে জানে ? লেজ ধরে প্রথমেই স্টেগোসরাসের পিঠে চাপল সলিল। উঠেই সে বাঁ হাত দিয়ে একটা ফলক আঁকড়ে ধরল। তারপর ডান হাতে একে-একে টেনে তুলল বাকি সবাইকে। প্রত্যেকেই এক-একটা ফলক ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

“যাক, জলকাদার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল একটু,” বলল ইমামি। কিন্তু ওদের এই স্বস্তি মোটেই দীর্ঘস্থায়ী হল না। স্টেগোসরাস হঠাৎ চলতে শুরু করল একদিকে।

“এ কী ? এ কী ?” স্টেগোটা নড়ছে কেন ?” চেঁচিয়ে উঠল ভিজে।

মরগোশ বলল, “এক-আধজন পিঠে চাপলে ও বোধ হয় টের পেত না। কিন্তু, আমরা আধডজন প্রাণী একই সঙ্গে ওর কাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। ওর বোধ হয় অস্বস্তি হচ্ছে। ”

স্টেগোসরাস হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গা-ঝাড়া দিল। ইমামি ছিটকে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। সকলেই আরও জোরে আঁকড়ে ধরল নিজের

নিজের ফলক।

একটু বাদে স্টেগোসরাস আবার এগিয়ে যেতে লাগল একদিকে। ওরা লক্ষ করল, এবার ও যেদিকে চলেছে, কাদার গভীরতা সেদিকেই বেশি। ভিজে চেঁচিয়ে উঠল, “ও কি আমাদের ঘোলা জলে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করছে নাকি ?”

“এসো, ওর কাঁধ থেকে নেমে পড়ি আমরা !” শুকনো মুখে বলল ইমামি।

“নামতেই হবে, তা ছাড়া কোনও উপায় নেই,” বলল মরগোশ, “কিন্তু ও যেভাবে নড়ছে, তাতে লাফিয়ে নামতে গিয়ে ওর পায়ের তলায় না পড়ে যাই !”

স্টেগোসরাসটা হঠাৎ পৃথিবীর আহ্নিক গতির মতো নিজের চারপাশেই দ্রুত ঘুরে গেল একবার। এরকম ঘূর্ণির জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না। সকলেই ছিটকে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। সকলেই আরও জোরে আঁকড়ে ধরল নিজের নিজের ফলক। হঠাৎ ইমামি চেঁচিয়ে উঠল, “এই মরেছে ! আমার চোখের অ্যালাইনমেন্টটা সরে গেছে। ”

ওরা সবাই ফিরে চাইল ইমামির দিকে। দেখল, ওর ডান হাত একটা ফলককে আঁকড়ে ধরে আছে দৃঢ়ভাবে। অন্য হাতটা শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফলকটার সন্ধানে। চন্দ্রবদন বলে উঠল, “হঠাৎ কী হল ওর ?”

নর্তনের মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, “আমিই ওকে নিয়ে এসেছি এখানে। ওর যদি কিছু হয়, আমি সকলকে কী বলব ?”

এমন সময় স্টেগোটা আবার এক পাক ঘুরে গেল নিজের চারপাশে। সবাই আবার আঁকড়ে ধরল নিজের নিজের ফলক। সলিল বলল, “ইমামির প্রবলেমটা কী ?”

“শরীরে বেশি ঝাঁকুনি লাগলে, গানুশদের চোখের অ্যালাইনমেন্ট মাঝে-মাঝে বিগড়ে যায়,” বলল নর্তন, “তখন ওদের দুটো চোখ সমস্ত জিনিসকেই দুটো আলাদা জায়গায় দেখতে থাকে। এ-ঘটনা বাড়িতে ঘটলে খুব একটা মুশকিল নেই। এক জায়গায় চুপ করে বসে পড়লেই হল। কিন্তু রাস্তাঘাটে ঘটলেই বিপদ। ”

“তা হলে কী হল এখন ?” শুকনো মুখে বলল সলিল। সলিলের কথা

শেষ হতে না হতেই প্রত্যাশিত দুর্ঘটনাটা ঘটল। স্টেগোসরাস নিজের চারপাশে আরও একবার দ্রুত ঘুরে গেল। সবাই সভয়ে তাকিয়ে দেখল, ইমামির একটা হাত ফলকের সন্ধানে আগে থেকেই শূন্যে হাতড়াচ্ছিল, স্টেগোর আহ্নিক গতির ফলে ওর অন্য হাতটাও ফলক থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। ইমামি ফলকটাকে আবার ধরতে চেষ্টা করল দু' হাত বাড়িয়ে , কিন্তু পারল না। হাত দুটো শূন্যেই ঘুরে এল একবার। তারপর টাল সামলাতে না পেরে চিৎকার করে জলকাদার মধ্যে পড়ে গেল ইমামি।

ইমামিকে বাঁচানোর জন্যে নর্তনও সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়ল কাদার মধ্যে। নর্তনের দেখাদেখি সলিলও। তারপর কী সর্বনাশ! স্টেগোসরাসের পেছনের বাঁ পা-টা এসে পড়ল একেবারে সলিলের বুকের ওপর। সলিলের দমবন্ধ হয়ে এল। স্টেগোর বিশাল পা-টাকে দু'হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে গোঁ-গোঁ করতে লাগল সলিল।

কে যেন সলিলকে ঠেলে দিয়ে বলল, "কী, কী হল ? অমন করছ কেন ?"

চোখ মেলে উঠে বসল সলিল। দেখল, ওদের আমগাছের ডগায় বসে আছে ও। ওর পাশেই বসে রয়েছে ওদের পাশের বাড়ির সাদেক চাচার মেয়ে রুকসানা।

সলিল রুকসানার অবাক মুখের দিকে চেয়ে দেখল একবার, তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "কিছু হয়নি !"

"কী বই পড়ছিলে গো ?" রুকসানা মাটিতে পড়ে থাকা বইটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

সলিল মাটির দিকে ফিরে চাইল। দেখল, বাঁধানো গীতবিতানখানা ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বইটা হাতে তুলে নিতে নিতে ও বলল, "গীতবিতান। "

"গীতবিতান ? কোন কবিতাটা পড়ছিলে ? জিজ্ঞেস করল রুকসানা, তারপর হেসে বলল, "মানে, কোন্ গানটা ?"

সলিলের মনে পড়ল, রুকসানা বেশ ভাল গান গায়। সলিল মুখে কিছু বলল না। গীতবিতানখানা উলটে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল গানটা।

রুকসানা দু'হাতে বইটাকে তুলে নিল নিজের কোলে। তারপর বইয়ের দিকে চোখ রেখে গেয়ে উঠল :

'স্বপন পারের ডাক শুনেছি, জেগে তাই তো ভাবি,
কেউ কখনও খুঁজে কি পায়, স্বপ্নলোকের চাবি ?'

মুখ তুলে দূর আকাশের দিকে চেয়ে দেখল সলিল। রুকসানার গান থেমে গেছে একটু আগে, সুরটা সলিলের কানের মধ্যে রিনরিন করছিল তখনও। ওর মনে হল আমি 'স্বপন পারের ডাকও শুনেছি। স্বপ্নলোকের চাবির সন্ধানও পেয়েছি। একবার নয় দু- দু'বার !'

মরগোশের চাবিটার কথা মনে পড়ে গেল সলিলের, যেটা দিয়ে জাম্বো ডিমের অন্দরে ঢোকার শেষ দরজাটা খুলেছিল নর্তন। ওই তো ! ওটাই তো স্বপ্নলোকের চাবি !

সলিলের মুখে হাসি ফুটে উঠল এবার।

রুকসানা ওর মুখের দিকে চেয়ে অবাক হল, বলল, "কী হল ?"

"কিছু নয় !" মাথা নাড়ল সলিল।

"সত্যিই কি কেউ স্বপ্নলোকের চাবি খুঁজে পায় ?" ধীরে-ধীরে প্রশ্ন করল রুকসানা।

সলিল রুকসানার মুখের দিকে ফিরে চাইল। রুকসানার মনেও সেই একই প্রশ্ন ? হঠাৎ ভিজের ডান কানের অপারেশনের কথা মনে পড়ে গেল ওর। মনে পড়ল ইমামির লাঠি হাতে নিয়ে কুঁজো হয়ে চলার কথা। সংবাদের একটা প্রতিশব্দ যে 'উপূপদ', সে-কথা মনে করে আবার হাসি ফুটল ওর মুখে। স্টেগোসরাসের কথা মনে পড়ল আবার। ইমামিকে বাঁচানোর জন্যে যার পিঠ থেকে ও লাফিয়ে পড়েছিল জলকাদার মধ্যে। অন্যমনস্ক ভাবে আবার আকাশের দিকে চোখ তুলল সলিল।

রুকসানা বলল, "কী হল ? কথা বলছ না যে ? সত্যিই কি কেউ স্বপ্নলোকের চাবি খুঁজে পায় ?"

সলিল আবার ফিরে চাইল রুকসানার মুখের দিকে, তারপর ঘাড় নেড়ে ধীরে ধীরে বলল, "পায় বইকী ! সবাই পায় কিনা, জানি না। কিন্তু কেউ কেউ যে পায়, তা আমি জানি। "

বিস্মিত দৃষ্টিতে সলিলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল রুকসানা, তারপর ধীরে ধীরে বলল, "স্বপ্নলোকের চাবির খোঁজ পেয়েছে, এমন কাউকে বুঝি চেনো ?"

"হ্যাঁ !" ঘাড় নাড়ল সলিল।

"তাই নাকি ? কে সে ?" রুকসানার চোখে বিস্ময়।

সলিল কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই মায়ের গলা ভেসে এল বাড়ির ভেতর থেকে, "সলিল, তুমি কি এখনও বাইরে ? বেলা গেছে অনেকক্ষণ, সন্ধে হয়ে এল, এবার বাড়িতে ফিরে এসো। "

সলিল আকাশের দিকে চেয়ে দেখল। দিনের আলো নিভে আসছে। সুয্যি ডোবে-ডোবে।

সলিলের মনে হল, "অনেক, অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম আমি। একেবারে ষোলো কোটি বছরের দূরত্ব অতিক্রম করে চলে গিয়েছিলাম। আদ্যিকালের সেই সুবাসিত পার্কে। সত্যিই বেলা গেছে, ঘরে ফেরার সময় হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সে রুকসানার দিকে ফিরে বলল, "মা ডাকছেন, চলো যাই। আমার সঙ্গে তুমিও এসো আমাদের বাড়িতে। যে স্বপ্নলোকের চাবির সন্ধান পেয়েছে, আজ তোমাকে আমি তার গল্প শোনাব। "

মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল দু'জনে। রুকসানার কোল থেকে গীতবিতান খানা নিজের হাতে তুলে নিল সলিল। দু'জনে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে। (সমাপ্ত)

ছবি : দেবাশিস দেব

ধারাবাহিক উপন্যাস

ভাঙা ডানার পাখি

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সাত

কালবৈশাখী ঝড় আসে বড় তাণ্ডব মূর্তিতে, তবে মিলিয়ে যেতেও তার খুব একটা সময় লাগে না। রাত ঘন হওয়ার আগেই আকাশ পরিপূর্ণ মেঘহীন হয়ে গেল। অসংখ্য তারা হিরের কুচির মতো ফুটে উঠেছে আকাশে। জ্বলছে-নিভছে জ্বলছে। আকাশের রং এখন টলটলে গাঢ় নীল। ঠিক নীলও নয়, কালো আর নীল মেশা এ এক অপরূপ বরন। একটু আগেও যে ভয়ঙ্কর ঝড়টা হয়ে গেল তার আর চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। উঁহু আছে। শান্ত হয়ে যাওয়া নদীর পাড়ে ইতিউতি ভাঙা ডালপালা, উপড়োন গাছ, কাঠিকুটি। পায়ের নীচে টলটল করছে কাদা।

অরুণাশ্ব ঝুঁকে পড়ে জীবদত্তকে দেখছিল। ভিজে মাটিতে পড়ে আছেন জীবদত্ত। এখনও তাঁর পুরোপুরি জ্ঞান ফেরেনি। মাঝে-মাঝে উঃ আঃ শব্দ করছেন, আবার নেতিয়ে পড়ছেন। অরুণাশ্ব কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। রোগাসোগা মানুষটাকে তীরে টেনে আনতে তার খুব একটা অসুবিধে হয়নি। বরং মানুষটা অজ্ঞান ছিলেন বলেই তাঁকে এক হাতে জাপটে ধরে জলের সঙ্গে লড়াই করতে করতে পাড়ে পৌঁছে গেছে। এবার তার কী করা উচিত ?

অরুণাশ্ব চাপা স্বরে ডাকল, "বদ্যিমশাই ?"

সাড়া নেই।

"ও বদ্যিমশাই, শুনছেন ?"

এবারও কোনও সাড়া নেই।

আরও ঝুঁকে জীবদত্তকে আলগা ঠেলতে গিয়ে অরুণাশ্ব চমকে উঠল। মানুষটার কপালে কী চটচট করছে ? রক্ত ? সাবধানে হাত ছোঁয়াল অরুণাশ্ব। এ হে, এ যে অনেকটা কেটে গেছে ! কিছুক্ষণের জন্য রক্তপাত বোধ হয় বন্ধ ছিল, আবার শুরু হয়েছে।

ঝটিতি কর্তব্য স্থির করে ফেলল অরুণাশ্ব। হ্যাঁচকা টানে পরনের কাপড় থেকে ছিঁড়ে নিল খানিকটা। থেবড়ে বসে জীবদত্তর মাথা তুলে নিয়েছে কোলে। ফেট্টি করে বাঁধছে কাপড়খানা।

তখনই আবার জীবদত্তর গোঙানি শোনা গেল, "মাগো !"

অরুণাশ্ব উৎসুক মুখে জিজ্ঞেস করল, "কী কষ্ট হচ্ছে বদ্যিমশাই ? ... ও বদ্যিমশাই ?"

কষ্ট করে জীবদত্ত চোখ খুললেন, "কে ?"

"আজ্ঞে আমি। অরুণাশ্ব। আপনার সেবক।"

"আমি কোথায় ?"

"আজ্ঞে, আপনি পাড়ে শুয়ে আছেন।"

একটু বুঝি নাড়া খেলেন জীবদত্ত। অরুণাশ্বর হাত আঁকড়ে ধরে উঠে বসার চেষ্টা করছেন। পারছেন না। অরুণাশ্বই তাঁকে আলতো করে তুলে বসাল।

জীবদত্ত ঘোলাটে চোখে তাকাচ্ছেন এদিক-ওদিক। কৃষ্ণপক্ষের রাত, চাঁদ এখনও ওঠেনি, বেশি দূর অবধি স্পষ্ট দেখা যায় না।

ভয়ার্ত গলায় জীবদত্ত প্রশ্ন করলেন, "আমাদের নৌকো কোথায় ?"

"ডুবে গেছে।"

"মাঝিমাল্লারা ? আর সবাই ?"

"আজ্ঞে, জানি না। ধারেকাছে কাউকে তো দেখছি না। আমি স্রোত ধরে ধরে আপনাকে নিয়ে..."

"তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ ?"

অরুণাশ্ব চুপ করে রইল। পৃথিবী বড় আজব জায়গা, এখানে কে যে কাকে কখন বাঁচায় ! বদ্যিমশাই তার হাতে বেড়ি খোলার চাবি না দিলে সে নিজেই তো এতক্ষণে কোথায় তলিয়ে যেত। কোনও মানুষের কোনও ভাল কাজই বৃথা যায় না। তাই হয়তো বদ্যিমশাইও বেঁচে গেলেন।

জীবদত্ত কাঁপা-কাঁপা হাত নিজের কপালে রেখেছেন, "উফ, বড় যন্ত্রণা।"

"আজ্ঞে, আপনার কপাল কেটে গেছে। বোধ হয় নৌকোতে আঘাত পেয়েছিলেন। ...শক্ত করে কাপড় বেঁধে দিয়েছি। রক্ত এখনও বন্ধ হয়নি।"

জীবদত্ত একটু একটু করে ধাতস্থ হচ্ছেন। বললেন, "কাছাকাছি কি কোথাও দূর্বাঘাস পাওয়া যাবে ?"

"দুব্বো ? দেখব ? ...আপনি একটু বসুন।"

বলেই তড়াং করে উঠে দাঁড়াল অরুণাশ্ব। অনেকদিন পর দামাল নদীর সঙ্গে হুটোপাটি করে তার শরীর এখন ভারী তরতাজা। অল্প-অল্প খিদে পাচ্ছে বটে,কিন্তু তার জন্যে দেহে-মনে কোথাও কোনও ক্লান্তি নেই। মিহি

আঁধারে চোখও অনেকটা সয়ে এসেছে, অন্ধকারও আর তত গাঢ় লাগে না।

খানিক দূরে একটা ঝাঁকড়ামতো গাছ। নীচটা তার ঘাসে ছাওয়া। সেখান থেকে মুঠো ভর্তি ঘাস নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ফিরছিল অরুণাশ্ব, তখনই শুনতে পেল গলাটা। বিরোচনের গলা।

অরুণাশ্ব দাঁড়িয়ে পড়ল। সেনাপতিমশাইও তবে বেঁচে আছেন ? কার ওপর এত হম্বিতম্বি করছেন ? এখনও ? এই সুনসান জায়গায় ?

লোকটাকে নৌকোয় দেখার পর থেকেই একটুও পছন্দ হয়নি অরুণাশ্বর। মানুষকে যে মানুষ বলে মনে করে না, তার ছায়া মাড়াতেও অরুণাশ্বর ঘৃণা হয়। তবু এই মুহূর্তে সে অনুভব করল লোকটা বেঁচে আছে ভাবতে তার খুব ভাল লাগছে। যতই মন্দ হোক, বেঘোরে প্রাণ হারালে লোকটার প্রিয়জনদের কী দশা হত ! আহা রে, নৌকোর আর সবাইও যেন এমন বেঁচে গিয়ে থাকে।

শব্দ লক্ষ্য করে অরুণাশ্ব পায়ে-পায়ে এগোল। বিশ-পঞ্চাশ হাত হেঁটেছে কি হাঁটেনি, ওমা, সামনে এক অদ্ভুত দৃশ্য। পাড় থেকে বেশ কিছুটা ভেতরে, এক ঝোপের ওপারে উঁচু ঢিবির মাথায় গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন বিরোচন, আর পেছন থেকে তাঁকে ক্রমাগত ঠেলে চলেছে বৃকোদর। অবিরাম ঠেলা খেয়েও নড়ছেন না বিরোচন। হাউমাউ চেঁচাচ্ছেন। আর তাই দেখে বৃকোদর হেসে কুটিপাটি।

অরুণাশ্ব চোখ রগড়াল। সত্যি দেখছে তো ? ওরা জ্যান্ত মানুষ তো ? না কি মাঝরাতে ভূত হয়ে খেলা করছে দু'জনে ?'

চটকা ভাঙল বিরোচনের হুঙ্কারে, "অ্যাই, তুই কোত্থেকে রে ? পালাচ্ছিস নাকি ?"

অরুণাশ্ব থতমত মুখে বলল, "কই, না তো। ...আপনার গলা পেয়ে ভারী আনন্দ হল, তাই দেখতে এলাম।"

"চালাকি হচ্ছে ? এক্ষুনি এক কোপে গলা নামিয়ে দেব।"

সঙ্গে-সঙ্গে বৃকোদর তিড়িং করে লাফিয়ে উঠেছে, "কী করে নামাবেন ? আপনার তলোয়ার তো জলে ভেসে গেছে।"

কী আশ্চর্য, পলকে মিইয়ে গেলেন বিরোচন ! ভার ভার গলায় বললেন, "ভেসে যায়নি। কুমিরে টেনে নিয়ে গেছে।"

"যেমনভাবে আপনার পোশাক টেনে নিয়েছে, সেইভাবে ? হিহি হিহি।"

বিরোচন গুম। এতক্ষণ পর আকাশে ফালি চাঁদ উঠেছে, আলো বেড়েছে সামান্য। অরুণাশ্ব পরিষ্কার লক্ষ করল সত্যিই সেনাপতিমশাইয়ের যোদ্ধার বেশটি হাঁটুর পর আর নেই। তাই কি উঠতে চাইছেন না তিনি ? লজ্জা পাচ্ছেন ?

অহঙ্কারী মানুষটার দশা দেখে অরুণাশ্বর হাসি পেয়ে গেল। উচিত জব্দ। পরক্ষণে নিজের মনকে শাসন করল অরুণাশ্ব। গত ক'দিনের অভিজ্ঞতা তাকে শিখিয়েছে মানুষ অসহায় অবস্থায় পড়লে তাকে দেখে কখনও উল্লসিত হতে নেই। নিজের আজকের সুদিন অবলীলায় কাল দুর্দিন হয়ে যেতে পারে।

শান্ত স্বরে অরুণাশ্ব বলল, "বামুনঠাকুরের ঠাট্টা আপনি গায়ে মাখবেন না সেনাপতিমশাই। সঙ্কোচ না করে আমার সঙ্গে চলুন।"

বিরোচন মিনমিন করে বললেন, "কোথায় যাব ?"

"ওদিকে। ওখানে বদ্যিমশাই আছেন।"

"অ্যাঁ ? কবরেজটাও তবে বেঁচে গেছে ?"

কী ভাষা ! বিরক্তি সামলে অরুণাশ্ব বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে তাঁর মাথায় জোর চোট লেগেছে। খুব রক্ত পড়ছে। আমি তাঁর জন্য দুব্বোঘাস..."

"তাই নাকি ? তবে তো গিয়ে দেখতে হয়।" বিরোচন উঠে দাঁড়িয়েছেন, "আমার সৈনিকগুলোর কী হাল হল কে জানে ! মনে হয় সব ব্যাটা টেঁসে গেছে।"

বিরোচনের সব জড়তা উধাও, আবার ফিরে এসেছে সেই সর্দারি ভঙ্গি। থপ থপ হাঁটছেন তিনি। হাঁটুঝুল, গায়ে লেপটে থাকা পোশাকে তাঁকে প্রকাণ্ড ভাল্লুকের মতো দেখাচ্ছে। জীবদত্তর কাছে পৌঁছনোর পর তাঁর কথার স্রোত রোখে কে ! সাত কাহন করে শোনাচ্ছেন কীভাবে তিনি নৌকো থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, নদীর ঠিক কোনখানটায় কুমির তাঁকে আক্রমণ করেছিল, কী অসম সাহসিকতার সঙ্গে সেই কুমিরের তিনি মোকাবিলা করেছিলেন ইত্যাদি। ইত্যাদি। বৃকোদর অবশ্য অরুণাশ্বর কানে-কানে অন্য কাহিনী শোনাল। বিরোচন নাকি সাঁতার জেনেও উত্তাল জলের সঙ্গে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছিলেন না, হাবুডুবু খাচ্ছিলেন খুব। বৃকোদরই তাঁর চুল ধরে টেনে তাঁকে পাড়ে নিয়ে এসেছে। কুমিরের গল্পটাও নাকি স্রেফ বানানো। জলের তোড়েই তাঁর পোশাক, কোমরবন্ধ সব ভেসে গেছে।

অরুণাশ্ব বুঝতে পারছিল না কার গল্পটা সত্যি। বৃকোদরের কি সত্যিই

শব্দসন্ধান

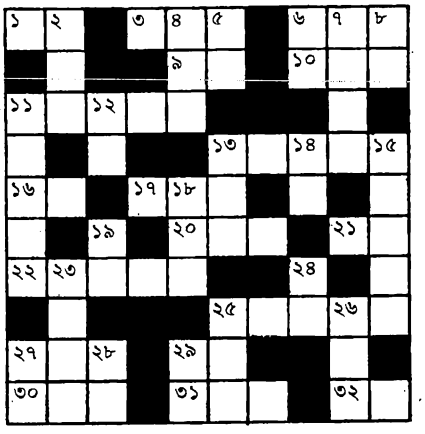

সঙ্কেত : পাশাপাশি : (১) ভাগ্যদোষে রঘুপতিকে এখানে বাস করতে হয়েছিল। (৩) কুলষিত, ঘোলা। (৬) শ্রীকৃষ্ণের এক গরিব বন্ধু। (৯) নতুন। (১০) খোঁড়া। (১১) অবিরাম। (১৩) করণীয় ব্যাপারে নিযুক্ত। (১৬) বিছানাপত্রের গাঁটরি। (১৭) যে কথা বলতে পারে না। (২০) আগেকার দিনে জেলে গেলে এ-খাদ্য অবশ্যই খেতে হত। (২১) পাপড়ি। (২২) মনোগত ভাব। (২৫) বাতাসের মতো দ্রুতগতি। (২৭) ভয়ঙ্কর। (২৯) যাকে তাল করা হয়। (৩০) 'উড়িল গগনে—পতাকা, ধ্বনিল শতেক শঙ্খ।' (৩১) আজকাল আসলের চেয়ে এর কদর বেশি। (৩২) 'তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিঘে—।'

উপর-নীচ : (২) নূতন। (৪) নম্র। (৫) কুশের ভাই। (৬) এ দুঃখের ভাই। (৭) যিনি দানে মুক্তহস্ত। (৮) 'মানীর—করিব হানি মানীরে শোভে হেন কাজ।' (১১) যার নাম প্রসিদ্ধ নয়। (২২) যে মেলার জন্য কলকাতা পাগল হয়। (১৩) ময়ূরপুচ্ছ। (১৪) আয় বুঝে যা করা উচিত। (১৫) অস্থির, চঞ্চল। (১৮) এই পতঙ্গের দংশনে বড় জ্বালা। (১৯) শক্তিতে মসির চেয়ে এ দুর্বল। (২৩) পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়। (২৪) গভীরভাবে স্মরণ। (২৫) নিমেষ। (২৬) আগ্রহ। (২৭) রবীন্দ্রনাথ এদের গুরু। (২৮) ধ্বংস। (২৯) — মাথা যার, বুদ্ধি নেবে তাঁর।

২২ এপ্রিল সংখ্যার সমাধান

দেবসেনাপতি

বিরোচনকে টেনে আনার মতো শক্তি আছে ? না কি বিরোচনের তত সাহস আছে ওই উদ্দাম নদীতে কুমিরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারার ? দু'জনের কারও গল্পকেই আমল না দিয়ে সে নেমে পড়ল জীবদত্তর শুশ্রূষায়। ঘাসগুলোকে দু'হাতে চেপে-চেপে থেঁতো করে নিল আগে, তারপর জীবদত্তর কপালের ফেট্টি খুলে ক্ষতস্থানে চেপে ধরল থ্যাঁতলানো ঘাস।

একটু পরে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল।

মানসিক ধাক্কা কাটিয়ে ধীরে-ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছেন জীবদত্ত। টুকরোটাকরা কথাবার্তা বলছেন। বৃকোদরের সঙ্গে, বিরোচনের সঙ্গেও। তবে তাঁর শরীর এখনও খুব দুর্বল, রাতটা তিনি জেগে বসে কোনওমতে নদীর পারেই কাটিয়ে দিতে চান। চারজন মিলে গল্পগুজব করলে ফুস করে রাত কেটে যাবে।

বিরোচন বাদ সাধলেন। বিপদ কেটে যাওয়ার পর তাঁর পেটে এখন চনচন করছে খিদে, এক্ষুনি তাঁর খাবার চাই। সেইমতো অরুণাশ্বর ওপর তাঁর হুকুম জারিও হয়ে গেল। তবে একা নয়, বৃকোদরকে সঙ্গে নিয়ে খাবারের খোঁজে যেতে হবে।

অরুণাশ্বর মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। আমতা-আমতা করে বলল, "আজ্ঞে, এই রাতে কোথায় খাবার পাব ? এদিকে কোথাও লোকালয় আছে কিনা তাও আমি জানি না..."

"আলবত আছে। তুমি জানলেও আছে, না জানলেও আছে।" গর্জে উঠেও কী যেন একটা ধন্দে পড়ে গেলেন বিরোচন। সংশয় মাখা গলায় বৃকোদরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা বামুনঠাকুর, আমরা নদীর কোন পারে আছি ? এপারে, না ওপারে ?"

"এপারে।" বৃকোদর ঝটপট জবাব দিল।

"উঁহু, এটা মনে হয় ওপার।"

"কী করে বুঝলেন ?"

"আরে বাবা, এপার হলে তো মাঝিমাল্লাগুলোকে সব দেখতে পাওয়া যেত। অন্তত চাঁদ মাঝিকে। ও ব্যাটারা হল গিয়ে জলের পোকা, কোনও ঝঞ্ঝাই ওদের ডোবাতে পারবে না।"

"ঠিকই।" বৃকোদর মিটিমিটি হাসছে, "কিন্তু এমনও তো হতে পারে, আমরা এপারে উঠেছি, ওরাই ওপারে উঠেছে ? কিংবা আমরা ওপারে উঠেছি, ওরা এপারে ? আবার এও হতে পারে আমরা ওপারে উঠেছি, ওরাও ওপারে ? আবার ধরুন এও হওয়া বিচিত্র নয়, আমরা ওরা সবাই এপারে উঠেছি, কিন্তু কোনও কারণে আমাদের দেখা হচ্ছে না ? কিংবা ধরুন..."

"থাক থাক। আর ধরার দরকার নেই।"

"কেন, শুনুন না। এ হল গিয়ে ন্যায়শাস্ত্রের কথা। টোলে ছাত্রদের পড়াতাম কিনা এসব। ...ব্যাপারটাকে আমরা অন্যভাবেও দেখতে পারি। আমরা যদি ওপারে উঠেও থাকি, তা হলে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে ওপারটা এপার হয়ে গেছে, আর এপারটা ওপার। আর যদি এপারে উঠে থাকি তবে তো কোনও সমস্যাই নেই। এপারটা এপারই আছে, ওপারটা ওপার। অর্থাৎ আপনি কোনওভাবেই ওপারে উঠতে পারেন না। ঠিক কিনা ?"

অরুণাশ্ব হাঁ করে বৃকোদরের আজব ব্যাখ্যা শুনছিল। হঠাৎ দূরে চোখ পড়েছে তার। আলো দেখা যাচ্ছে না ? ওই মাঠের ওদিকে ?

হ্যাঁ, আলোই। বিন্দুর মতো ফুটকি আলোটুকু দুলছে মৃদু মৃদু, অরুণাশ্বর চোখ সেদিকে স্থির। আলোটা কি একটু একটু করে বড় হচ্ছে ? এগিয়ে আসছে কি ? ওটা কি মশাল ?

অরুণাশ্ব টান-টান হয়ে বসল। দেখাদেখি অন্যরাও।

এত গভীর রাতে কে আসে এদিকে !

ছবি : নির্মলেন্দু মণ্ডল

(ক্রমশ)

মাত্র পৌনে দু'বছর আগেও মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল আর রঞ্জি-দলিপের মতো ঘরোয়া টুর্নামেন্টের বাইরে তিনি ছিলেন না কোথাও। তারপর হঠাৎ ইংল্যান্ড সফরে দলে সুযোগ এবং বাকিটা ইতিহাস। বেহালার বীরেন রায় রোড থেকে উঠে এসে এক বঙ্গসন্তান কীভাবে আজ বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম তারকা? সাফল্যের শিখরে পৌঁছনোর রাস্তাটা ঠিক কতটা পিচ্ছিল? বহু অজানা কাহিনী তুলে এনেছেন সব্যসাচী সরকার

লর্ডস থেকে ঢাকা

॥ ৬ ॥

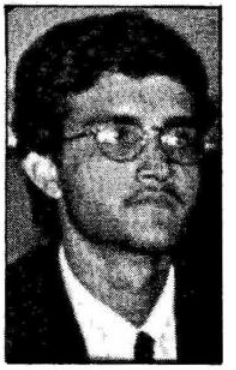

ঘন্টা দেড়েক খেলা হতে না হতে স্কোরবোর্ডে ছয় উইকেটে ৮৯। সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবের প্রেসবক্সে বসে ততক্ষণে কপির 'ইন্ট্রো' লেখা শুরু করে দিয়েছেন দু-একজন অস্ট্রেলীয় সাংবাদিক। টসে হেরে ভারত আগে ব্যাট করছে আর একের পর এক উইকেট পড়ছে। কুইন্সল্যান্ডের 'দ্য হেরল্ড' কাগজের রবার্ট ক্র্যাডক ফিসফিস করে বলল, "গান-গুলি ছেলেটা আজ এত পরে নামল কেন? তোমরা তো ওর দেশের লোক, তোমরা কিছু জানো না?"

তিন-চার বা পাঁচ নয়, সৌরভ ব্যাট করতে এসেছিলেন সাত নম্বরে। মোঙ্গিয়া-শচীন ওপেন করেছিলেন। মোঙ্গিয়া ৩৮ করলেও শচীন (৭) ব্যর্থ। তিনে নেমে দ্রাবিড় করলেন ১৩। আজহার, কাম্বলি আর জাডেজা তিনজনে মিলে করলেন ১০ রান। সৌরভ যখন ক্রিজে এলেন, ভারত পাঁচ উইকেটে ৭২, আমরা ভারতীয়রাও সব আশা ছেড়ে দিয়েছি। খেলাও হয়েছে সবে ১৩ ওভার। ওই অবস্থা থেকে সুনীল জোশি আর সৌরভ টেনে তুলতে লাগলেন ভারতকে। সৌরভ করলেন ৫৯ রান, একদিনের ম্যাচে তাঁর প্রথম হাফ সেঞ্চুরি। জোশি করলেন ৪৮। ২০১ রানের একটা ভদ্রস্থ স্কোরে টিম পৌঁছল, কিন্তু ম্যাচ বাঁচানো গেল না। অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে সিঙ্গার কাপ থেকে ছিটকে গেল ভারত।

অধিনায়ক হয়ে জীবনের প্রথম টুর্নামেন্টেই বিশ্রি হার, ফাইনালেই ওঠা গেল না। থমথমে মুখে প্রেসের সামনে

সৌরভ ও শচীন

ফোটো : অশোক মজুমদার

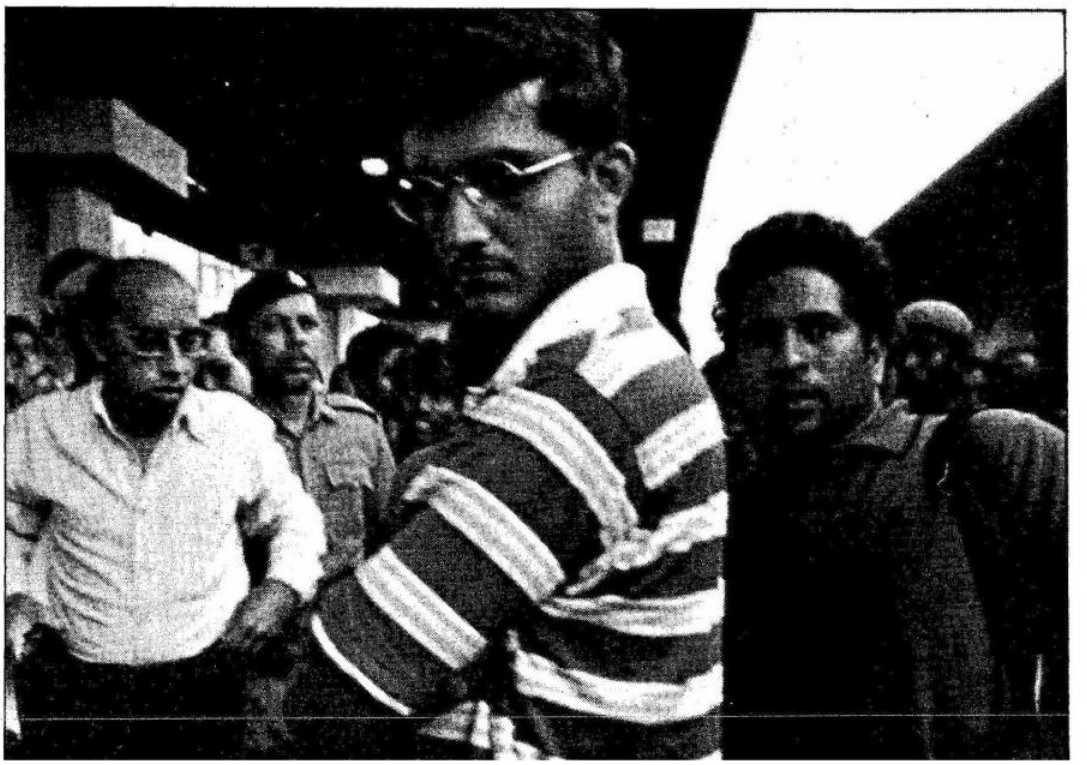

কয়েকজন বলতে সৌরভ কার কথা বলতে চাইছেন, বুঝতে অসুবিধে হল না। গোটা টিমে তখন সন্দীপ পাটিলের নাম 'বিয়ার্ডি', কারণ, তাঁর দাড়ি। প্রতি সন্ধ্যায় তিনি নিজের ঘরে ডেকে নিচ্ছিলেন বিনোদ কাম্বলিকে, তারপর বসছিল আসর। 'টিম-মিটিং'য়ে এক দিন গ্লাস হাতে ঢুকেছিলেন বলে প্রতিবাদ জানান প্রশাসনিক ম্যানেজার সমীরণ চক্রবর্তী। কিন্তু তাতে সুরাহা কিছুই হয়নি।

এসেছিলেন শচীন। বিষণ্ণ মুখে সৌরভ আর জোশির প্রশংসা করছিলেন। পাশে দাঁড়িয়ে সন্দীপ পাটিল। অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের আগে গত তিনদিন ধরে তাঁর কাছে আমরা 'স্ট্র্যাটেজি', 'পজিটিভ ক্রিকেট' আর 'স্পেসিফিক ফ্রেম অব মাইন্ড' এত শুনেছি যে, ভাবা হচ্ছিল আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ এনে দিয়ে টিমকে ফাইনালে তুলে দেবেন তিনি। পাটিলের 'মুখেন মারিতং জগৎ'-এর পৃথিবী অবশ্য অস্ট্রেলিয়া ম্যাচেই ভেঙে খানখান। 'পরের টুর্নামেন্টে দেখা যাবে' গোছের মন্তব্য করে পাটিল যখন হোটেলে ফেরার বাসের দিকে এগোচ্ছেন, বাসের জানলা দিয়ে মুখ বের করে সৌরভ বললেন, "রাতে হোটেলে থেকো। কথা আছে।"

রাত ঠিক পৌনে দশটায় লঙ্কা ওবেরয় হোটেলে আমাদের ঘরে এলেন সৌরভ। সেই ঘরে আমার সঙ্গেই ছিলেন আনন্দবাজারের কার্যনির্বাহী সম্পাদক সুমন চট্টোপাধ্যায়। কলম্বোর রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে লেখার জন্য সুমনদা সেবার শ্রীলঙ্কায়। হোটেলের ঘরে আমি, সুমনদা ছাড়াও কলকাতার আরও দুই সাংবাদিক। খাওয়াদাওয়া হচ্ছে, গল্প হচ্ছে, তবু দেখলাম কিছুতেই স্থির হতে পারছেন না সৌরভ। একটা সময় ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বললেন, "জানো আমার খুব ভাল মনে হচ্ছে না। গোটা টিমে একটা দমবন্ধ-করা পরিস্থিতি। ওরা বোধ হয় কিছু একটা প্ল্যান করেছে।"

সৌরভকে থামিয়ে দিয়ে সুমনদা বললেন, "প্ল্যান করেছে মানে? কে কী করতে পারে? তোমার বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে গোটা কলকাতায় ঝড় বয়ে যাবে...."

সৌরভ বললেন, "অতশত জানি না। তবে একটা আঁচ তো পাওয়া যায়। ক্যাপ্টেন শচীনকে আমার বেশ লাগছে, সবসময় উৎসাহ দিচ্ছে। কিন্তু বাকি কয়েকজন...."

কয়েকজন বলতে সৌরভ কার কথা বলতে চাইছেন, বুঝতে অসুবিধে হল না। গোটা টিমে তখন সন্দীপ পাটিলের নাম 'বিয়ার্ডি', কারণ, তাঁর দাড়ি। প্রতি সন্ধ্যায় তিনি নিজের ঘরে ডেকে নিচ্ছিলেন বিনোদ কাম্বলিকে, তারপর বসছিল আসর। টিম-মিটিংয়ে একদিন গ্লাস হাতে ঢুকেছিলেন বলে প্রতিবাদ জানান প্রশাসনিক ম্যানেজার সমীরণ চক্রবর্তী। কিন্তু তাতে সুরাহা কিছুই হয়নি। আড়ালে-আবডালে তাঁকে নিয়েও শুরু হয় হাসাহাসি।

সেই রাতে আমাদের ঘরে বসে কথায়-কথায় অনেক কিছুই বলেছিলেন সৌরভ। ইংল্যান্ড সফরে প্রথম-প্রথম তাঁকে কীভাবে দেখা হত, কে কী বলত, এইসব। কথায় কথায় বেরোল, সন্দীপ পাটিলের এখন একটাই 'টার্গেট'—সৌরভকে প্রথম ১১ জনের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া। জগমোহন ডালমিয়া তখন ভারতীয় বোর্ড সচিব। কিন্তু সেটাই ছিল সৌরভের 'মাইনাস পয়েন্ট'। সৌরভ বাংলার, সেজন্যই ডালমিয়ার পক্ষে আগ বাড়িয়ে তাঁর হয়ে কিছু বলা সম্ভব ছিল না। কিছু বলতে গেলেই সর্বভারতীয় প্রেস ঝাঁপিয়ে পড়ত। অভিযোগ উঠত পক্ষপাতপূর্ণ আচরণের।

কলম্বোর ওই হোটেলে সেই রাতে সৌরভের একটা কথা আজও ভুলতে পারি না, "আমি জানি, এটা একটা খুব কঠিন দুনিয়া। এখানে কেউ কারও বন্ধু নয়, কেউ কারও পাশে দাঁড়ায় না। প্রত্যেকে নিজের-নিজের ভালটা বুঝে নিচ্ছে। সেইমতো নিজেকে এগিয়ে নিচ্ছে। এখানে একটা বেঁফাস মন্তব্য করে ফেললেই কেউ গিয়ে লাগিয়ে দেবে—প্রতি মুহূর্তে এ যেন এক 'টাইট রোপ ওয়াকিং'। আমি জানি না, শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াব আমি—তবে আমি খুব ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছেলে। ঈশ্বর যদি পাশে থাকেন, আমি খেলবই। তোমরা দেখে নিয়ো।"

ব্যাপারটা যে ঠিক অত সহজ নয়, বুঝলাম টরন্টোয়। সেটাই ছিল প্রথম সহারা কাপ। তখন বেশ ঠাণ্ডা কানাডার এই শহরে, তার ওপর সংগঠকদের ভোগাচ্ছিল বৃষ্টি। একটু বৃষ্টি হলেই ঠাণ্ডা বাড়ছিল, দুটো সোয়েটার গায়ে না চাপালে বেরনো যাচ্ছিল না। প্রথম ম্যাচটায় ভারতকে জিতিয়ে দিয়েছিল শচীন-ঝড়, দ্বিতীয়টায় পাকিস্তানকে জেতাল সেলিম মালিকের ব্যাটিং। প্রথম ম্যাচটায় ব্যাটই করতে হয়নি সৌরভকে, দ্বিতীয়টায় ৮ বলে করেছেন ১১ নট আউট। তৃতীয় ম্যাচের আগের দিন 'ফোর সিজন্‌স ইন অন দ্য পার্ক' হোটেলে গল্পচ্ছলে বললেন, "একটু আগে ব্যাট করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু যেখানে সুযোগ পাচ্ছি, সেখানেই কিছু করে দেখাতে হবে, তিন নম্বর ম্যাচটায় আমি ঠিক ক্লিক করে যাব।"

পরদিন সকালে যখন টরন্টো ক্রিকেট, স্কেটিং এবং কার্লিং ক্লাবের মাঠের প্রেসরুমে আমাদের হাতে টিমের ১১ জনের নাম লেখা ছাপানো কাগজ এল, দেখলাম সৌরভের নাম নেই। ভারতীয় সাংবাদিকরা এ-ওর দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছি। ম্যাচ শুরুর আগেই দৌড়ে গিয়ে ধরলাম শচীনকে। সহজ জবাব তাঁর, "পাঁচজন বিশেষজ্ঞ বোলার খেলাব ঠিক করেছি এই ম্যাচে। সেজন্য সৌরভকে বাদ দিতে হল। কাউকে না কাউকে তো টিমের জন্য বসতেই হয়।"

শচীন এ কথা বললেন, কিন্তু তারও আগে ভারতীয় প্রেস জেনে ফেলেছে আগের রাতের টিম মিটিংয়ের ঘটনা। ৮ বলে ১১ নট আউট করা নিয়ে একের পর এক কামান দাগা হয় সৌরভের দিকে। বলা বাহুল্য, নায়ক সেই 'বিয়ার্ডি'। বলা হয়, শেষদিকে নেমে যতটা মারা উচিত ছিল, মারতে পারেননি সৌরভ। তাঁর 'রানিং বিটুইন দ্য উইকেট্‌স' নিয়ে তীব্র সমালোচনা করে পাটিল বলেন, "অন্যরা যে সময়ে তিন রান নেয়, ও সেখানে এক রান নেয়। ও টেস্টে খুব ভাল ব্যাট, কিন্তু ওয়ান ডে-তে না খেলালেও চলবে। টিমের কোনও অসুবিধে হবে না।" ওই ম্যাচে কে খেললেন সৌরভের জায়গায়? বিনোদ কাম্বলি। শেষ দুটো ম্যাচে তাঁর রান? এক আর তিন!

ম্যাচ শুরু হওয়ার পর দেখলাম, ড্রেসিংরুমের সিঁড়ির ঠিক নীচে উদাস মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন সৌরভ। জানতেনই না পেছনে কী ধরনের অঙ্ক সক্রিয়। বললেন, "কাল টিম মিটিংয়ের পরও কিছু জানতে পারিনি। বিশ্বাস করো, আমি কোনও আঁচই পাইনি। সকালে মাঠে এসে

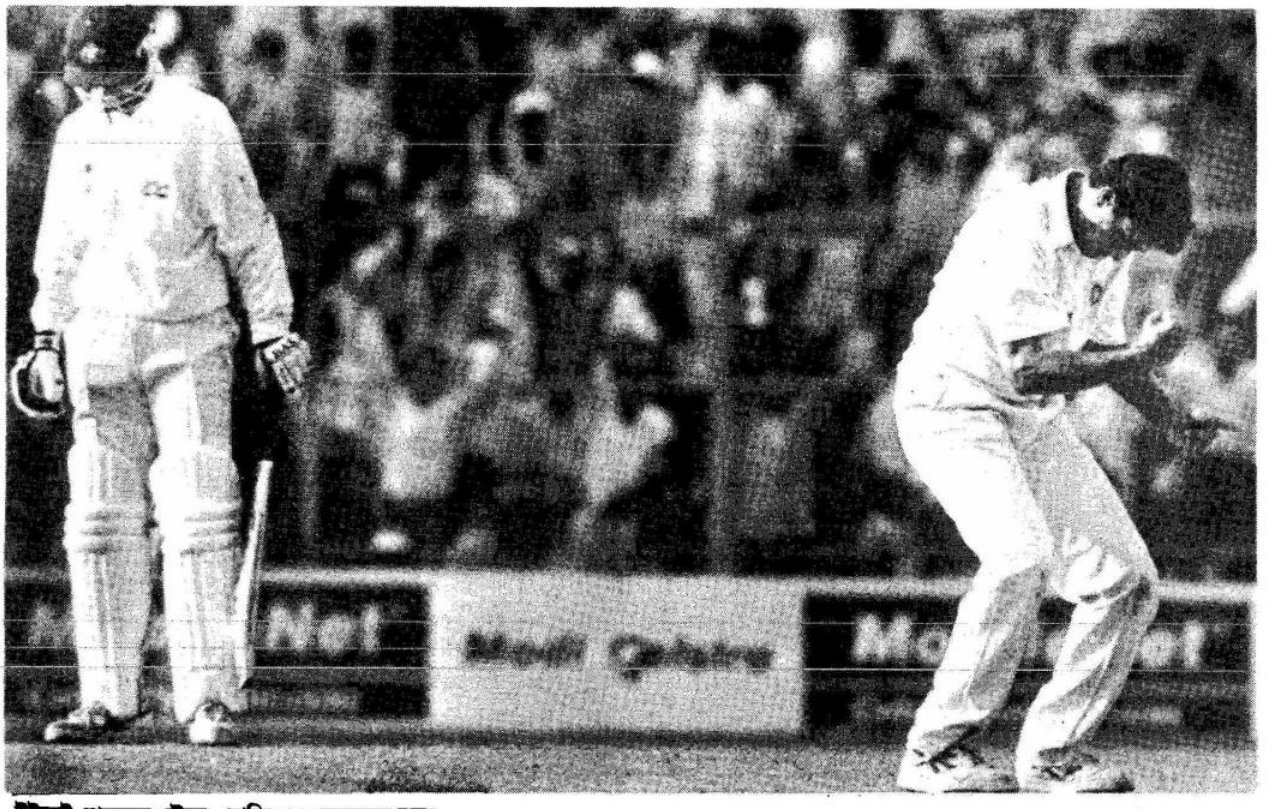

উইকেট পেয়েছেন সৌরভ, বোলিং-এও কেড়েছেন নজর

ফোটো : তপন দাশ

জানতে পারলাম, আমি বাদ।"

"কেউ কিছু বলেনি ?"

সৌরভ বললেন, "শুধু শচীন বলেছে, কিছু মনে কোরো না। এই ম্যাচটায় তোমাকে খেলাতে পারছি না।"

সকালে ম্যাচ শুরুর আগে ঘটে যায় আরও একটা ঘটনা। সৌরভের নাম টিমলিস্টে না দেখে সেলিম মালিক হঠাৎ সৌরভকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি আনফিট নাকি, তাই খেলছ না ?" সৌরভকে বাদ দেওয়া হয়েছে শুনে মালিকের মন্তব্য, "বড্ড বেশি রান করে ফেলেছ তো, এইরকম হবেই।"

চোখ-মুখ থমথম করছে, কিন্তু সৌরভ আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে। ড্রেসিংরুমের সিঁড়ির কোণে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম। হঠাৎ সৌরভ বললেন, "এখানে বেশিক্ষণ থেকো না। কলকাতার সাংবাদিকদের সঙ্গে আমাকে দেখলেই এখন ও (পড়ুন পাটিল) সন্দেহ করবে। কলম্বোয় যে আমরা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতাম, সে-খবর কিন্তু ওর কানে পৌঁছে গেছে।"

এদিকে, বারবার কলকাতার আনন্দবাজার অফিস থেকে ফোন পাচ্ছি টরন্টোর প্রেসবক্সে। স্পোর্টস এডিটর রূপকদা বললেন, "ম্যাচ পরে হবে, তুমি আগে সৌরভ কেন বাদ পড়ল তা নিয়ে বড় করে কপি পাঠাও। অফিসে বসে থাকা যাচ্ছে না। এত ফোন আসছে।" টরন্টোয় যখন প্রতিদিন ম্যাচ শুরু হচ্ছিল, ভারতীয় সময় তখন সন্ধে সাতটা। তাড়াহুড়ো করে সৌরভের কপি পাঠিয়ে শুনি, লাঞ্চের সময় সন্দীপ পাটিল একটা প্রেস মিট ডেকেছেন। কারণ ? প্রবাসী এক বঙ্গসন্তান !

প্রবাসী বাঙালি দীপেন্দু চক্রবর্তী টরন্টোয় দীর্ঘদিন আছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও টরন্টো গিয়ে তাঁর অতিথি হয়েছেন। দীপেন্দুবাবু দিলখোলা লোক, সহজ কথা সহজভাবে বলতে ভালবাসেন। ম্যাচ দেখতে এসে সৌরভ বাদ শুনে তিনি এত রেগে যান যে, সোজা সন্দীপ পাটিলকে বলে বসেন, "কেন বাদ দিয়েছেন সৌরভকে ? কেন ?"

পাটিল প্রথমে বলেন, "এটা টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত। আপনাকে বলতে যাব কেন ?"

দীপেন্দুবাবু উত্তরে বলেন, "কিসের টিম ম্যানেজমেন্ট ? ওসব বুঝি না। ইউ মাস্ট এক্সপ্লেন। ইউ কান্ট ডু দিস কাইন্ড অব ইনজাস্টিস।"

দীপেন্দুবাবু ও পাটিলের মধ্যে কথা কাটাকাটি যখন প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যাওয়ার মুখে, তখনই সংগঠকদের কয়েকজন ব্যাপারটা সামলে দেন। অগত্যা, দুপুরে পাটিল তড়িঘড়ি ডেকে ফেললেন এক প্রেস মিট।

দুপুরে প্রেসবক্সের সামনে সৌরভকে সঙ্গে নিয়ে এলেন পাটিল। সৌরভকে প্রেসের সামনে বলতে হল : "আমার বাদ পড়ার পেছনে কোনও চক্রান্ত বা উদ্দেশ্য নেই। আমাকে না খেলালে যদি টিমের লাভ হয়, আমি অবশ্যই রাজি, এই নিয়ে এর বেশি কিছুই বলতে চাই না আমি। সুযোগ পেলে নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করব, ব্যস।"

সকালে ম্যাচ শুরুর আগে ঘটে যায় আরও একটা ঘটনা। সৌরভের নাম 'টিম লিস্ট'-এ না দেখে সেলিম মালিক হঠাৎ সৌরভকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি 'আনফিট' নাকি, তাই খেলছ না ?"

ইডেনের 'পিচ' দেখছেন সৌরভ ফোটো : দেবীপ্রসাদ সিংহ

এটুকুই সৌরভকে দিয়ে বলাতে চাইছিলেন পাটিল। সৌরভ বললেনও। এতেই ব্যাপারটা মিটে যেতে পারত। কিন্তু পরের দিন প্রেস মিটে পাটিল আমাদের কয়েকজনের সামনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে যা বললেন, কান গরম হয়ে গেল। "তৃতীয় ম্যাচটা ভারত জিতে যাওয়ায় পাটিল তখন বুক ফুলিয়ে ঘুরছেন। তাঁর কাছে খবর পৌঁছে গিয়েছিল, হাজার-হাজার কিলোমিটার দূরে কলকাতা তাঁর একটা সিদ্ধান্তে উত্তাল। এমনকী তেণ্ডুলকর যে তেণ্ডুলকর, তাঁর ছবিতেও কলকাতায় পরানো হয়েছে জুতোর মালা। রাতারাতি ভিলেন হয়ে গিয়েছেন শচীন।

পাটিল গম্ভীরভাবে বললেন, "শুনলাম, গাঙ্গুলি বাদ পড়েছে বলে কলকাতায় খুব চেঁচামেচি হচ্ছে—হাস্যকর! কই বিক্রম রাঠোর বাদ পড়লে তো পঞ্জাবে হুল্লোড় হয় না। সবকিছুতেই কলকাতার বাড়াবাড়ি—এত প্রাদেশিক কেন বাংলা—মনে রাখবেন, টিমটার নাম ইন্ডিয়া, ক্যালকাটা নয়—"

যেন বিক্রম রাঠোর আর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় একই মানের ক্রিকেটার। যেন রাঠোরেরও জীবনের প্রথম দুটো টেস্টে দুটো সেঞ্চুরি আছে। পাটিলের এই বক্তব্য কলকাতার কাগজে বেরোতেই শুরু হল আরও একপ্রস্থ বিতর্ক। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা অসম্ভব মনের জোরে সামলাচ্ছিলেন সৌরভ। হোটেলে বসে বললেন, "কলকাতার মানুষ আমাকে ভালবাসেন, আমি বাদ পড়ায় ওঁরা কতটা দুঃখ পেয়েছেন, আমি বুঝছি। কিন্তু এসব করে কার কী লাভ হবে? টিমে আরও বেশি চাপে পড়ে যাব আমি! শেষমেশ ক্ষতিটা আমারই হবে।"

সহারা কাপের চার নম্বর ম্যাচেও সৌরভকে খেলানো হল না এবং হেরে গেল ভারত। সিরিজ ২-২। পঞ্চম ও শেষ ম্যাচের আগের দিন হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে নেমে সৌরভ টিম বাসের দিকে এগোচ্ছেন, হঠাৎই মুখোমুখি দীর্ঘদেহী এক কৃষ্ণাঙ্গের সঙ্গে। দেখলাম, সার গ্যারি সোবার্স সৌরভের দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন করমর্দনের হাত। বলছেন, "হে ম্যান, আই স ইউ স্কোরিং আ হান্ড্রেড অ্যাট লর্ড্স। গ্রেট নক দ্যাট।"

কানাডার ক্রিকেট বোর্ডের অতিথি ছাড়াও সার গ্যারি সেবার টরন্টোয় এসেছিলেন ধারাভাষ্য দিতে। কথায় কথায় বেরোল, লর্ড্সে সৌরভের সেঞ্চুরির বেশ কিছু স্ট্রোক মনে রেখেছেন। বললেন, "তোমার ব্যাটিং খুবই ভাল, কিন্তু অনসাইডে আর একটু জোরালো হওয়া দরকার। অফস্পিনারকে খেলার সময় তোমাকে কিন্তু একটু নড়বড়ে লাগে।"

মন দিয়ে বাধ্য ছাত্রের মতো সোবার্সের কথা শুনছিলেন সৌরভ। কাল্পনিক একটা ব্যাট হাতে নিয়ে সোবার্স বোঝাচ্ছিলেন, সাকলিন মুস্তাককে খেলার সময় ব্যাটটা কোনখান থেকে নামা উচিত। কথা বলে গাড়িতে গিয়ে ওঠার আগে দৌড়ে গিয়ে সার গ্যারিকে ধরলাম।

আপনি ঠিক কতখানি আশাবাদী সৌরভ সম্পর্কে? সার গ্যারি ভুরু কুঁচকে তাকান। "অপটিমিস্টিক? হি ইজ আ রেয়ার ট্যালেন্ট, স্পেশ্যালি হিজ অফসাইড ইজ ব্রিলিয়ান্ট। টু গুড।"

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "লারার চেয়েও ভাল?"

সোবার্স এবার সতর্ক। কৌশলী হাসি তাঁর মুখে। যেন কী চাওয়া হচ্ছে, বুঝে ফেলেছেন। বললেন, "নো ম্যান, নো, আয়াম নট গোয়িং টু পয়েন্ট অন দ্যাট—আমি জানি, তুমি একটা ভাল হেডলাইন খুঁজছ—"

সোবার্স তুলনায় গেলেন না বটে, কিন্তু বয়কট যাচ্ছিলেন। ওই টরন্টোতেই তিনি বলে ফেলেন, অফসাইডে লারার চেয়েও ভাল সৌরভ। স্বয়ং সৌরভ এসবে বিচলিত হচ্ছিলেন না। কারণ, জেনে গিয়েছিলেন, পঞ্চম ম্যাচটায় তাঁকে খেলানো হচ্ছে।

সেই ম্যাচে আহামরি কিছু করেননি সৌরভ, মাত্র ১৩। পরে ব্যাট করে সাকলিন আর মুস্তাক আমেদের স্পিনে শেষ হয়ে যাচ্ছিল ভারত। প্রথম সহারা কাপ উঠে যাচ্ছিল ওয়াসিম আক্রমের হাতে আর প্যাভিলিয়নে বসে কালো থেকে আরও কালো হয়ে উঠছিল সন্দীপ পাটিলের মুখ।

সহারা কাপ থেকে টিম ফিরতে না ফিরতে ভারতীয় বোর্ডের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলেন পাটিল। চাকরি যাওয়ার।

(ক্রমশ)

মন দিয়ে বাধ্য ছাত্রের মতো সোবার্সের কথা শুনছিলেন সৌরভ। কাল্পনিক একটা ব্যাট হাতে নিয়ে সোবার্স বোঝাচ্ছিলেন, সাকলিন মুস্তাককে খেলার সময় ব্যাটটা কোনখান থেকে নামা উচিত।

গল্প

সোনালি মাছ

শুভাশিস মৈত্র

উঁচু পাহাড়ের পায়ের কাছে লীলাবতীদের গ্রাম। গ্রামের নাম এক্কা। সেই গ্রামে ছিলেন এক ছোট জমিদার। গ্রামে ছোট ছোট বাড়ি। বাড়ির সামনে বাগান, পাহাড়ের ঝরনা গ্রামের পুব দিক দিয়ে নদী হয়ে বয়ে গেছে। বাগানে রঙিন প্রজাপতি ওড়ে। সেখানে খেলে বেড়ায় লীলাবতী, আত্রেয়ী, মৌরানী আর তাদের বন্ধুরা। কখনও কুমির ডাঙা, কখনও এক্কা-দোক্কা। কখনও আত্রেয়ী এসে লীলাবতীর চোখ পেছন থেকে ছোট ছোট দু'হাতের পাতা দিয়ে চেপে ধরে ডাক দেয়, "আয় রে আমার মৌরিফুল।" মৌরিফুল তখন পা টিপে টিপে এসে কপালে টোকা দিয়ে যায়, লীলাবতীর কপালে। এইসব নানা খেলায় লীলাবতী, আত্রেয়ীদের দিন কাটে। পড়া কম, খেলা বেশি আর গল্প শোনায়। এক্কা গ্রামের বড়রা অবশ্য ব্যস্ত মানুষ। চাষবাস করেন। যাত্রা দেখেন শীতকালে। কাছেই খাড়া পাহাড়, পাহাড়ে গাছপালা প্রায় নেই। লোকে বলে আগে নাকি ছিল। সবুজ ছিল পাহাড়। তবে গ্রামে সরু-সরু পথের দু'ধারে এখনও বড় বড় সব প্রাচীন গাছ। ছায়া দেয়। পাখি ডাকে সারাটা দিন। ঘুড়ি ওড়ে আকাশে। সবুজ মাঠও আছে। ধানখেত, সবজির খেত তো আছেই। গ্রামের সীমানায় আছে মতিঝিল। এই ঝিলের জলে নাকি অনেক আগে মুক্তো মিলত। তাই নাম মতিঝিল। মতিঝিলে অনেক দূর থেকে উড়ে উড়ে হাঁস আসে।

এই মতিঝিলেই একদিন এক কাণ্ড ঘটল। ঝিলের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন গ্রামের সবচেয়ে দুষ্টু ছেলে নন্দর পিসি। নন্দর পিসি এই গ্রামেরই মেয়ে। ডাকনাম পাখি। ছেলেমেয়েরা পাখিপিসি বলে। ভয় পায়। আবার পাখিপিসি না হলে ওদের রবীন্দ্রজয়ন্তী, পুজোর চারদিনের নাটক কিছুই হবে না।

পাখিপিসিই দেখলেন প্রথম। আর দেখা থেকেই চিৎকার জুড়ে দিলেন— সোনার মাছ। পাখিপিসির বিবরণ অনুযায়ী, এক বিরাট সোনালি রঙের মাছ হুশ করে ভেসে উঠেছিল মতিঝিলে। কয়েক মুহূর্ত। তারপরই আবার ডুব। সেই থেকে চেঁচাচ্ছেন পিসি 'সোনার মাছ, সোনার মাছ' করে। এসব সকাল দশটার কথা। এক ঘণ্টা কাটতে-না-কাটতেই গ্রাম জুড়ে হইহই কাণ্ড। প্রায় কুড়ি বছর আগে আরব সাগরে জাহাজডুবিতে হারিয়ে যাওয়া হারু গ্রামে ফিরে এসেছে। হারুর এখন বয়স হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ। বড়রা বলছেন, মুখ-চোখ নাকি একই রকম আছে। চিনতে ভুল হচ্ছে না।

গ্রামসুদ্ধু ঝাঁপিয়ে এসেছে ওদের বাড়িতে। হারু, তার এখন বড় হয়ে যাওয়া দুই ছেলেকে কোলে বসিয়ে জাহাজডুবির গল্প বলছে। কীভাবে চলে গিয়েছিল ভেসে ভেসে অন্য দেশে। কোন রাজার জেলখানার বন্দি হয়ে ছিল অকারণে। হারুর বৃদ্ধা মা সামনে বসে হাসছেন, মাঝে-মাঝে কাঁদছেন, আর ফিরে পাওয়া ছেলের হাতে, গালে, কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

এই ঘটনার ঠিক সতেরো দিন পর। আবার ভেসে উঠল সোনালি মাছ। এবার দেখতে

পেলেন শিবশঙ্করবাবু। গ্রামের স্কুলের ভূগোলের সার। দেখার ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যে মেধাবী ছাত্র অমল মণ্ডলের টেলিগ্রাম এল। ভুজঙ্গ মণ্ডল ধারদেনা করে ছেলে অমলকে কলকাতায় পড়তে পাঠিয়েছিলেন। পড়া শেষ করে গবেষণা করছিল অমল। টেলিগ্রাম এল অমলের। বাবাকে প্রণাম জানিয়ে অমল লিখেছে, সে পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট পেয়েছে। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত পৃথিবীর সবচেয়ে নামী বিজ্ঞান-পত্রিকায় তার লেখা ছাপা হয়েছে।

এই দুটো ঘটনার পর থেকেই গ্রামের কেউ কেউ সোনালি মাছ আর সুখবরের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পেল। মতিঝিলকে অনেকে সুখীঝিল নামে ডাকতেও শুরু করল।

তৃতীয় ঘটনা ঘটল মাসখানেক পরে। গ্রামের এক বৃদ্ধা সোনালি মাছ দেখতে পেলেন সুখীঝিলে। তার পর-পরই খবর এল, গ্রামে পাকা রাস্তা হবে। সরকারি লোকজন এসেছে। মাপজোক শুরু করেছে। এই রাস্তা নাকি গিয়ে জুড়বে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে জাতীয় সড়কের সঙ্গে।

এর পর আর কোনও সন্দেহ রইল না যে, সোনালি মাছ সুখবর বয়ে আনে। সে গ্রামের সবচেয়ে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, এ নিয়ে আর কোনও মতবিরোধও রইল না। এর পর থেকে কখনও সাত-দশদিন পরে, কখন, এক-দেড় মাস পরে, সোনালি মাছকে দেখা যেতে লাগল। আর ভাল-ভাল খবরের বন্যায় ভেসে গেল এক্কা গ্রাম। সোনালি মাছ দেখার আশায় সুখীঝিলের পাশে গ্রামের লোকেরা ভিড় করে দিন রাত দাঁড়িয়ে থাকতে শুরু করল প্রথমদিকে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, দল বেঁধে কেউ সোনালি মাছ দেখতে পেল না। বারবারই একই ঘটনা। আচমকা একজনের চোখের সামনেই ভেসে উঠতে শুরু করল সোনালি মাছ।

সোনালি মাছ দেখবে বলে অনেকে, ঘুরপথ হলেও, সব কাজেই সুখীঝিলের ধার দিয়ে যাতায়াত শুরু করল। সবাই মিলে চাঁদা তুলে ঝিলের ধারের রাস্তায় মোরাম বিছিয়ে দিল। পবন সাঁতরা চারটে খুঁটি পুঁতে ছোট একটা চায়ের দোকানও খুলে বসল। ন'বছরের গলু পরীক্ষার আগে বাবার বকুনি খেয়ে মাঠের ধারে মাটির তলায় পুঁতে রেখেছিল ওর বয়াম-ভর্তি মার্বেল। হাফইয়ার্লি পরীক্ষার পর মায়ের পারমিশান নিয়ে সেই মার্বেল মাটির তলা থেকে তুলে আনতে গিয়ে জায়গাটা আর মনে করতে পারল না গলু। এখানে ওখানে সেখানে এক হাত দেড় হাত করে গর্ত খুঁড়ল। কিন্তু পাওয়া গেল না। গলুর তাই মন খুব খারাপ।

হাঁটতে হাঁটতে সুখীঝিলের ধারে গিয়ে পুরনো পেয়ারাগাছের তলায় বসে পড়ল গলু। ঝিলের জলের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে। ভরদুপুর তখন। হঠাৎ গলুর চোখের সামনে ভুস করে ভেসে উঠল সোনালি মাছ। বিস্ময়ে চোখ বড় করে গলু ছুট লাগাল রাস্তা দিয়ে। খবরটা বাড়িতে দিতে হবে। কিন্তু বাড়ি যাওয়া হল না। মাঝপথে ছুটতে ছুটতেই হঠাৎ হেসে উঠল গলু। তারপরই আরও জোরে উলটো দিকে মাঠের উদ্দেশে ছুট লাগাল গলু। মনে পড়ে গেছে মার্বেল কোথায় লুকিয়েছিল।

এভাবেই একদিন সোনালি মাছ দেখে অবসরপ্রাপ্ত সিপাই নিরাপদ সিংহ তাঁর নিখোঁজ হয়ে যাওয়া পোষা নেড়ি কুকুর দুরন্ত দুর্মদকে ফিরে পেলেন। গ্রামের সবচেয়ে রগচটা বদরাগী মানুষ চণ্ডীচরণই একমাত্র সোনালি মাছ দেখার পর কোনও সুখবর পেলেন না। দিনতিনেক কেটে যাওয়ার পরও। গ্রামসুদ্ধু অবাক ! অবাক চণ্ডীচরণবাবুও। তবে কি আর সুখবর আসবে না ! এমন সময় ছেলে-বুড়ো সবাই আবিষ্কার করল, চণ্ডীবাবু কেমন যেন বদলে গেছেন। লোকজন দেখলে আর আগের মতো রেগে ওঠেন না, হাসছেন মিটিমিটি, সব রাগ যেন কোথায় উধাও হয়ে গেছে। একেবারে যেন মাটির মানুষটি। পুজোর চাঁদার বই হাতে ছেলেদের দেখলে যিনি দু'দিন আগেও গাল দিয়ে তেড়ে আসতেন, সেই লোক নিজে গত রবিবার সকালে ছেলেদের আদর করে ডেকেছেন। ঘরে বসিয়ে পায়েস খাইয়ে একশো টাকা চাঁদা দিয়েছেন, গ্রামের সবাই দারুণ খুশি। বদরাগী চণ্ডীবাবুকে আড়ালে এখন লোকে সোনালি চণ্ডী বলে ডাকে।

এদিকে এক্কা গ্রামের ঝিলে সোনার মাছ আছে, সেই মাছ সুখবর দেয়, এসব কথা চাপা থাকেনি। ধীরে-ধীরে তা পাঁচকান হয়ে চোর-ডাকাতের কানে গেল। একদিন গভীর রাতে লরি করে এল ডাকাতদল। হাতে তাদের গাদা বন্দুক। তারা সোনালি মাছ কী করে চুরি করা যায় তা নিয়ে মাঝরাতে পরামর্শ করতে বসল ঝিলের ধারে। অনেক আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের পর বিরাট জাল দিয়ে ভোররাতে ঝিলের সব মাছ তুলে লরিতে ভর্তি করল ডাকাতরা। নিজেদের ডেরায় গিয়ে লরির সব মাছ মাঠে বিছিয়ে সোনার মাছ নাকি তারা খুঁজে বের করবে। এইসব আলোচনা করতে করতে লরি বোঝাই মাছ নিয়ে ডাকাতদল হইহই করতে করতে চলে গেল ভোরের আগে। গ্রামের লোক "সব্বনাশ হয়ে গেল" বলে কাঁদল। "হায় হায়" করল। ডাকাতদের গাল দিল। একদল মাছ চুরির কেস লেখাতে থানার পথে হাঁটা দিল। বিজ্ঞরা বললেন, "যা হয়েছে হয়েছে। কী আর করা যাবে। সোনালি মাছ যখন ছিল না তখনই আমরা কি খুব দুঃখে ছিলাম !"

গ্রামের লোক হয়তো সোনালি মাছের কথা ভুলেই যেত। কিন্তু তা হল না। এর পর থেকে গ্রামের মানুষের যতরকম দুঃখ-কষ্টের ঘটনা ঘটতেই থাকল। সবাই বলল, সোনালি মাছ নেই তাই এসব হচ্ছে। দু' মাসের মধ্যে এক্কা গ্রামের হতচ্ছাড়া চেহারা হল। প্রথমে খবর এল গ্রামের জমিদার মতিঝিল ভরাট করে নাকি সেখানে পাকা বাড়ি বানাবেন। গ্রামের পথের ধারের প্রাচীন গাছগুলোও একে-একে কেটে বিক্রি করতে শুরু করলেন জমিদারবাবু। গাছের পাখি সব বিপদ আঁচ করে কোথায় যে চলে গেল, কে জানে। গ্রামে আর পাখি রইল না। মাঠের সবুজ ঘাস শুকোতে শুরু করল কোনও অজানা কারণে। গ্রামের গোরু-ছাগলের অসুখ হল। সব মিলে এক বছরের মাথায় এক্কা গ্রাম বিধ্বস্ত। সবাই বিহিত খুঁজছে। নানারকম নিদান দিচ্ছে নানা লোকে। কিন্তু ফল কিছুই হল না। এই যখন অবস্থা তখন একদিন লীলাবতী মনে মনে ঠিক করল সে যাবে সোনালি মাছ খুঁজে আনতে। গ্রামের মানুষের দুঃখ দূর করতে খুব ভোরবেলা একদিন লীলাবতী চুপি-চুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। কোন দিকে যাবে তা জানে না, তবুও বেরিয়ে পড়ল। কোথায় খুঁজবে সোনালি মাছ জানে না, তবু বেরিয়ে পড়ল। কীভাবে কোন পথে যাবে তাও জানে না, তবু বেরিয়ে পড়ল। হাঁটতে-হাঁটতে, হাঁটতে-হাঁটতে গ্রামের শেষ মাথায় এসে মতিঝিলের কাছে এক বুড়ির সঙ্গে দেখা। বুড়ি লাঠি হাতে হাঁটছিল। ঝুঁকে পড়েছে। চুল সব সাদা। বুড়ি লীলাবতীকে দেখে বলল, "আমি জানি তুই কোথায় যাচ্ছিস।" লীলাবতী অবাক ! বলল, "বুড়িমা, আমি কোথায় যাচ্ছি তা তো আমিই জানি না। তুমি যখন জানো, আমাকে বলে দাও কোথায় গেলে ফিরে পাব আমাদের সোনালি মাছ।"

বুড়ি হেসে বলল, "এই পাহাড়ের মাথায় চলে যা। সেখানে বড় বড় গুহা পাবি। ঝরনা পাবি। ঝরনার জলে ভাল করে খুঁজে দেখিস। পাবি। কোন ঝরনার জলে তা বলতে পারব না, তবে পাবি। কোনও একটা ঝরনার জলেই পাবি। আর এই নে," বলে, বুড়ি তার পানের বাটা থেকে একটা ছোট পান বের করে লীলাবতীর হাতে দিয়ে বলল, "এটা রাখ। বিপদে-আপদে সাহায্য করবে।" এই বলে বুড়ি চলে গেল। লীলাবতী ফ্রকের পকেটে পানপাতা

রেখে পাহাড়ের গা বেয়ে, খাঁজ বেয়ে ওঠা শুরু করল।

সকাল থেকে দুপুর হল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল এল। এল সন্ধ্যা। সন্ধ্যা নামতেই একটু ভয় হল লীলাবতীর। আর সন্ধ্যার মুখে গাছপালাহীন ধূসর পাহাড়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে প্রথমে একটা গুহা চোখে পড়ল। তার ধার দিয়ে একটা ঝরনার ধারাও দেখা গেল। সন্ধ্যা নেমেছে, জলে কোনও মাছই দেখা যাচ্ছে না। ফলে এখানে খুঁজে লাভ নেই। ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। রাতে থাকবে কোথায়? চিন্তায় পড়ে গেল, পকেট থেকে পানপাতা বের করে লীলাবতী পরীক্ষা করার জন্য বলল, "পানপাতা, পানপাতা, এই কি সেই ঝরনা?"

পানপাতা হাতের পাতায় প্রথমে একটু নড়ল, তারপর বলল, "সে আমি কী জানি, খুঁজে দ্যাখো।"

লীলাবতী আবার বলল, "পানপাতা, পানপাতা, ওই গুহায় রাতে কি থাকব আমি, বিপদে পড়ব না তো?"

পানপাতা একটু বেশিই নড়ে উঠল এবার, যেন চটে গেছে। ঝাঁঝিয়ে উঠল পানপাতা, "এতই যদি ভিতু তবে এসব কাজে এলে কেন, গুহায় বিপদ হবে কি না তার আমি কী জানি!"

লীলাবতী বুঝল, পানপাতা রেগে গেছে কোনও কারণে। এইসব ভেবে ঝরনার ধারে বসল চুপটি করে। কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। পানপাতারও বোধ হয় কষ্ট হল লীলাবতীর অবস্থা দেখে। ফ্রকের পকেট থেকে এবার সরু গলায় পানপাতার কথা শোনা গেল, "হ্যাঁ ভাই, শুনছ? আমি বলছি। শোনো, তুমি সেই থেকে আমাকে পকেটে ভরে রেখেছ। নিজের স্বার্থ ছাড়া তো কিছু ভাবো না। এতটা রাস্তা এলে, একটা কথা বললে না। এখন নিজে ভয় পেয়েছ বলে সাহায্য চাইছ। আমি তো কখন থেকে বসে আছি, তুমি আমায় বন্ধু করে নেবে বলে। তা তোমার দিক থেকে কোনও সাড়াই নেই। যেচে বন্ধু করা আমার ধাতে সয় না।" পানপাতার বকবকানি থামতেই চায় না। ক্লান্তিতে দু'চোখ বুজে আসছে লীলাবতীর।

পানপাতাকে থামাতেই লীলাবতী বলে উঠল, "যা হয়েছে হয়েছে, ছেড়ে দাও ভাই, ভুল হয়ে গেছে। এই তো তোমার বন্ধু হলাম, মনখারাপ কোরো না। এবার বলো দেখি, তুমি আমাকে কী সাহায্য করতে পারো?"

পানপাতা বলল, "সেই কথাই তো বহুক্ষণ থেকে বলার চেষ্টা করছি। এক লাইনের যে মন্ত্রটা আমাকে বুড়িমা শিখিয়েছিল, সেটাই আমার তোমাকে শেখানোর কথা। পাখিপড়া করে আমাকে বুড়িমা শিখিয়েছিল রে!"

"শিখিয়েছিলেন তো ভালই, আমায় তুমি সেটা বলে দাও," বলল লীলাবতী।

এবার চি চি করে পানপাতা বলল, "সেটা কি আর আমার মনে আছে রে? কিছুতেই মনে আসছে না। তোমার ফ্রকের পকেটে ঢোকার আগে পর্যন্ত তো সবই ঠিক ছিল। তারপর একটু ঝিমুনি এসেছিল, তুমি কথা বলছ না দেখে অপেক্ষা করে-করে। তারপর এমন রাগ হল যে, কী বলব! আর তাতেই বোধ হয় সব ভুলে গেছি।"

"এখন কী হবে," কাতরভাবে প্রশ্ন করে লীলাবতী। পানপাতা তার লম্বা বোঁটা দিয়ে নিজের পাতার একটা জায়গা চুলকোতে লাগল খসখস করে। লীলাবতীর মনে হল, ওই জায়গাটা বোধ হয় ওর গাল। কিংবা মাথাও হতে পারে। আঙুলের মতো বোঁটা দিয়ে চুলকোচ্ছে। যেমন আমরা করি, ভুলে যাওয়া কিছু মনে করার জন্য।

"চুপ করে আছ কেন, বলো না কী হবে এখন? ফিরে যাব বুড়িমার কাছে আবার," জানতে চায় লীলাবতী।

পানপাতা আবার খানিক, গাল না মাথা কী যেন, সেই জায়গাটা চুলকে নিয়ে বলল, "বিপদে পড়লে তবে তো তোমাকে সাহায্য করার কথা, ধরো যদি বিপদে না পড়ো, তবে আমারও কিছু করতে হবে না। আশা করি সব নিরাপদেই মিটে যাবে। তবু, এটা জেনে রাখো লীলাভাই না নীলিমা, কী যেন নাম বললে তোমার?"

"লীলাবতী।"

"হ্যাঁ, এটা জেনে রাখো লীলাবতীয়া, মন্ত্র না মনে পড়লেও, আমার আরও কিছু ক্ষমতা আছে। আমি দুনিয়ার সব জিনিসের গন্ধ চিনি। অনেক দূর থেকে গন্ধ পাই। তার আগে বলো দেখি তুমি কাঠখোট্টা খাড়া এই পাহাড়ে একা এসেছ কী করতে? কী চাও তুমি, বলো লালবাতি বলো?"

লীলাবতীর ভয়ানক রাগ হল। বলল, "দ্যাখো তোমাকে যদি কানপাতা বা ধানপাতা বলে ডাকি, তোমার ভাল লাগবে?"

"না, না, কেন লাগবে," বলল পানপাতা।

"তবে আমাকে লীলাবতীয়া, লালবাতি এসব হাবিজাবি নামে ডাকবে না। আমি লীলাবতী।"

"ঠিক, ঠিক, আসলে জানো তো, ভুলে যাই, ভীষণ ভুলো মন আমার," বলল পানপাতা।

ওর কথা শুনে হাসি পেল লীলাবতীর। এর পর সোনালি মাছ খোঁজার গল্প বলল লীলাবতী পানপাতাকে হাতের পাতায় নিয়ে। পানপাতা সব শুনে বলল, "এই কথা আগে বলতে হয়! আমি ভেবেছি তুমি রাক্ষসটাক্ষস মারতে এসেছ। যেমন রূপকথায় থাকে। প্রথমে তা হলে তুমি আমাকে ওই গুহার সামনে নিয়ে গিয়ে বোঁটা ধরে হাত উঁচু করে বাতাসে দোলাতে দোলাতে ঘোরাও। আমি বাতাসের গন্ধ শুঁকে বলে দেব গুহায় ভয়ের কিছু আছে কি না। যদি নিরাপদ হয়, আজ রাতে আমরা ওখানে থাকব। সকাল হলে, আবার তুমি আমাকে বাতাসে দোলাবে। আমি গন্ধ শুঁকে বলে দেব কোথায় পাবে সোনালি মাছ।" এই বলে পানপাতা থামল।

লীলাবতী গুহার সামনে গিয়ে পানপাতার বোঁটা ধরে হাওয়ায় দোলাতে থাকল। পানপাতার গলা শোনা গেল, "এবার থামো। বলো দেখি, লালকা ... সরি, লীলাবতী, তুমি চামচিকে ভয় পাও?"

লীলাবতী বলল, "তা পাই, গায়ে এসে পড়ে যে!"

পানপাতা বলল, "তা পড়ে, তবে ক্ষতি করে না। এই গুহায় চামচিকে ছাড়া কিছু নেই। ভয় পেয়ো না। চলে এসো।"

সত্যি-সত্যিই দু-একটা চামচিকের ঝটপট আওয়াজ পাওয়া গেল। লীলাবতী ব্যাগ থেকে মোমবাতি বের করে জ্বেলে দিল। ব্যাগে সামান্য ক'টা বিস্কুট আর জল ছিল। খেয়ে নিল। এর পর পানপাতার ডাকে যখন ঘুম ভাঙল, তখন সকালের আলো দেখা যাচ্ছে গুহার মুখ দিয়ে। দু'জনে বাইরে এল। কিছুক্ষণ বাতাসে গন্ধ শুঁকেই পানপাতা এবার বলে দিল ডান দিকে কিছুটা পাহাড় বেয়ে এগোলেই যে ঝরনা পাওয়া যাবে সেখানেই মিলবে সোনালি মাছ। হলও তাই, আনন্দে দু'চোখে জল এসে গেল লীলাবতীর। দেখল ঝরনার স্বচ্ছ জলে ছোট্ট ছোট্ট অদ্ভুত সোনালি মাছ খেলা করছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন সোনার সুচ নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে জলের নীচে। লীলাবতী বলল, "সোনালি মাছ তো পেলাম, কিন্তু যে মাছ খুঁজছি সেটা তো ছিল অনেক বড়।"

পানপাতা বলল, "তোমার যেমন বুদ্ধি, অত বড় হলে নিতে পারতে? ছোট নিয়ে সুখীঝিলে ছেড়ে দাও, দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাবে।"

যুক্তিটা মনে ধরল লীলাবতীর। ছোট পলিথিন প্যাক সঙ্গে ছিল। কিছুক্ষণের চেষ্টায় একটা মাছ ধরে পলিপ্যাকে ভরে রাবার ব্যান্ড দিয়ে তার মুখ আটকে দিল লীলাবতী। তারপর বলল, "চলো, এবার ফেরারা পালা।"

পানপাতা বলল, "হ্যাঁ, চলো।"

ছবি : নির্মলেন্দু মণ্ডল

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

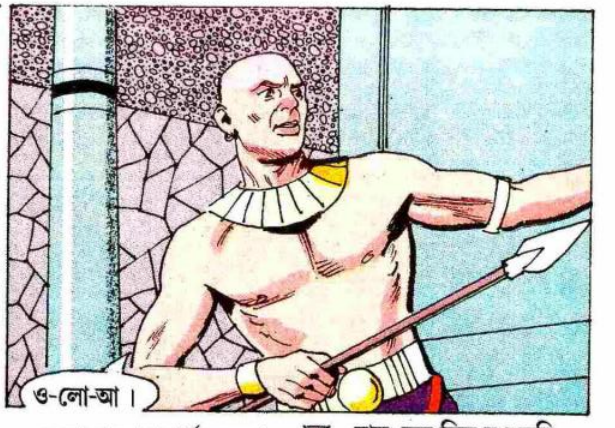

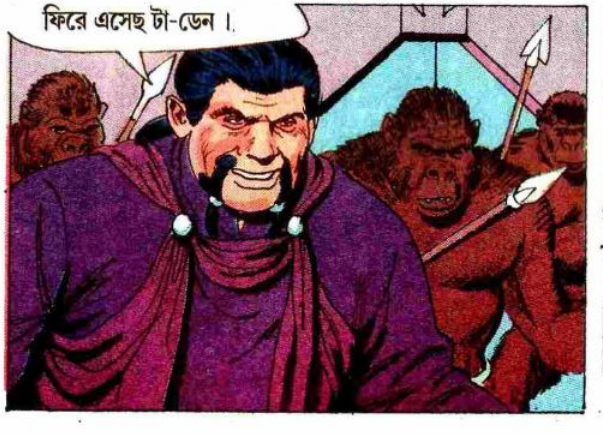

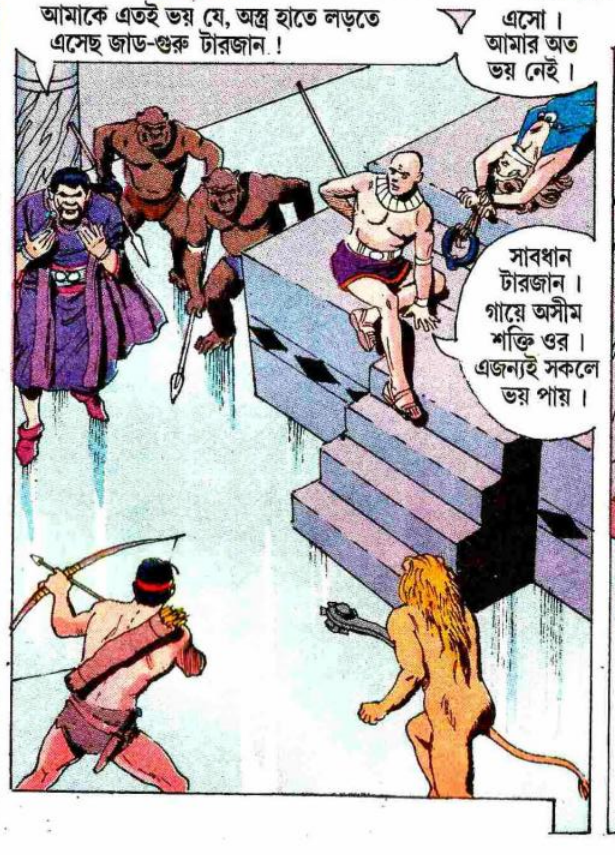

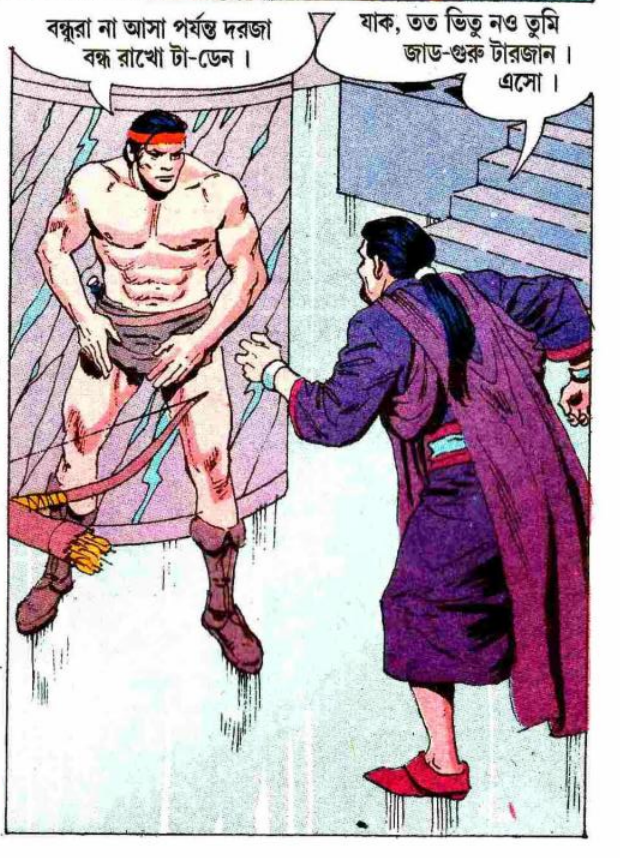

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

জার-উন মন্দিরে বলি দিতে যাচ্ছিল ও-লো-আ এবং তার সন্তানদের... তার ঠিক আগেই তাদের উদ্ধারে সেখানে হাজির সঙ্গী-সহ টারজান...

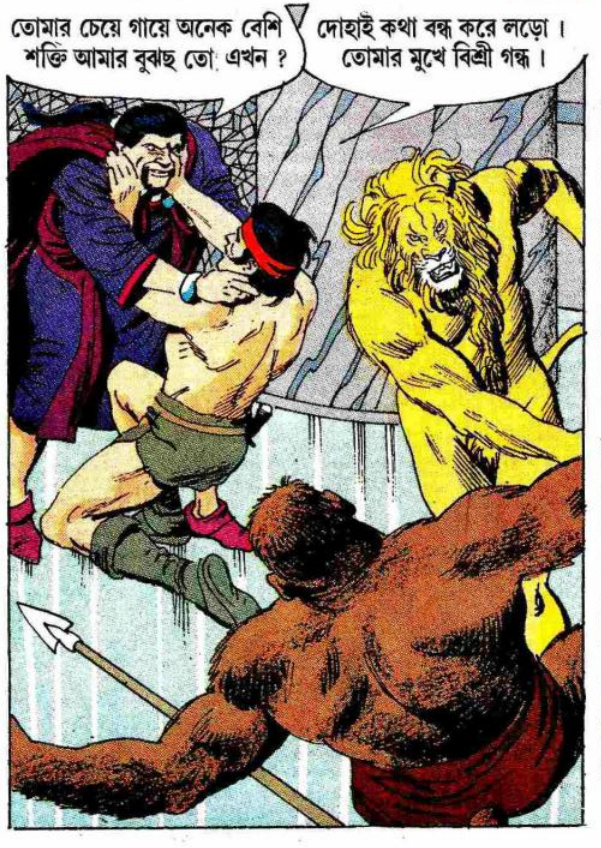

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

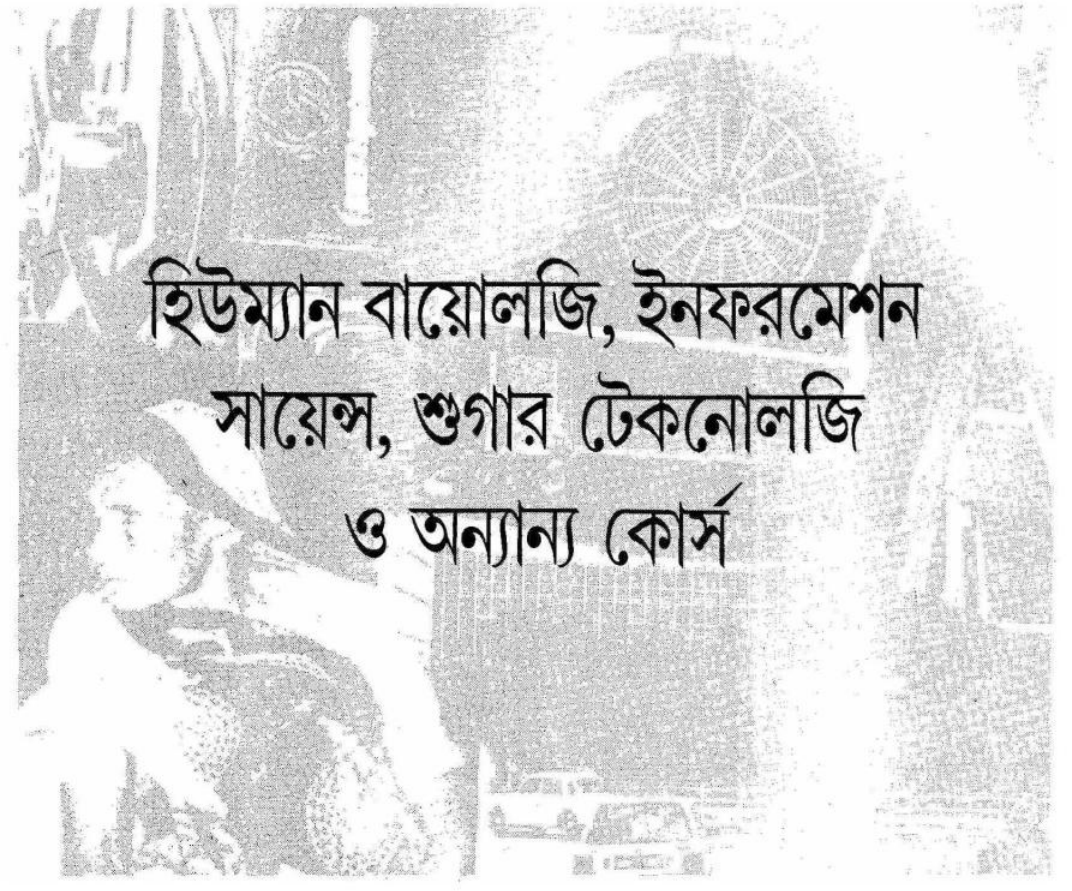

হিউম্যান বায়োলজি, ইনফরমেশন সায়েন্স, শুগার টেকনোলজি ও অন্যান্য কোর্স

নয়াদিল্লির এ. আই. ই. এম. এস.-এর এম. এস্‌সি কোর্সে ভর্তির সুযোগ পেতে কিংবা শুগার টেকনোলজি পড়ার জন্য কী করণীয়— এইসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জানানো হল ; সেই সঙ্গে দেওয়া হল বেশ কিছু পাঠক-পাঠিকার চিঠির উত্তরও ।

অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস

(আনসারিনগর, নয়াদিল্লি-১১০ ০২৯) এবার 'হিউম্যান বায়োলজি অনার্স কোর্স'-এ এবং 'অ্যানাটমি', 'বায়োফিজিক্স', ' ফিজিওলজি', 'ফার্মাকোলজি', 'ড্রাগ অ্যাশে', 'বায়োটেকনোলজি' বিষয়ে এম. এস্‌সি কোর্সে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করছে । এসব কোর্সে ভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে । অনার্স কোর্সের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২১ জুন '৯৮ তারিখে এবং 'এম. এস্‌সি' কোর্সের জন্য ১৯ জুলাই '৯৮ তারিখে, কেবলমাত্র দিল্লি শহরে ।

আবশ্যিক শিক্ষাগত যোগ্যতা : অনার্স কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে ১০+২ পর্যায়ের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় 'ফিজিক্স', 'কেমিস্ট্রি', 'বায়োলজি', 'ইংলিশ' বিষয়সহ এইসব বিষয়ে এগ্রিগেটে কমপক্ষে ৬০ শতাংশ (তফসিলি ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ) নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে । এ বছর যাঁরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছেন, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন । তবে ৩১ ডিসেম্বর '৯৮ তারিখে প্রার্থীর বয়স কমপক্ষে ১৭ বছর হতে হবে ।

অ্যানাটমি, বায়োকেমিস্ট্রি, বায়োফিজিক্স, ফিজিওলজি বিষয়ে এম. এসসি কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে হিউম্যান বায়োলজিতে অনার্সসহ 'বি.এস্‌সি', 'বি. ভি. এস্‌সি', সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'বি.এস্‌সি অনার্স' যে-কোনও পরীক্ষায় কমপক্ষে ৬০ শতাংশ (তফসিলি ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) নম্বরসহ পাশ করতে হবে ।

ফার্মাকোলজি, ড্রাগ অ্যাশে বিষয়ে ভর্তি হতে হলে উপরোক্ত পরীক্ষায় অথবা বি. ফার্ম পরীক্ষায় কমপক্ষে ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে (তফসিলি ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) পাশ করতে হবে । বায়োটেকনোলজি কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে 'এম. বি. বি. এস', 'বি. ভি. এস্‌সি,' 'বি. এস্‌সি,' 'হিউম্যান বায়োলজি' অথবা 'বায়োকেমিস্ট্রি', 'বায়োফিজিক্স', 'বায়োটেকনোলজি,' 'বটানি', 'জেনেটিক্স', 'হিউম্যান বায়োলজি', 'লাইফসায়েন্স', 'মাইক্রোবায়োলজি', 'জুলজি', 'কেমিস্ট্রি,' 'ফিজিক্স' যে-কোনও একটি বিষয়ে অনার্স

পরীক্ষায় কমপক্ষে ৬০ শতাংশ (তফসিলি ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) নম্বরসহ পাশ করতে হবে।

কীভাবে আবেদন করবেন : প্রয়োজনীয় 'ফর্ম ও 'প্রসপেক্টাস' 'ইনস্টিটিউট'-এর 'রিসেপশন কাউন্টার' থেকে সাধারণ 'ক্যাটিগরি'র প্রার্থীদের ৩০০ টাকা ও তফসিলি জাতি/ উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের ১৭৫ টাকার 'ড্রাফ্ট'-এর বিনিময়ে বিলি করা হয়। ড্রাফ্ট কাটতে হয় 'স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া', সার্ভিস ব্রাঞ্চ,' কোড নং ৭৬৮৭, নয়াদিল্লির ওপর। ডাকযোগে ফর্ম পেতে হলে ওই মূল্যের ব্যাঙ্ক ড্রাফ্টসহ ২৫×১৫ সেন্টিমিটার মাপের নাম-ঠিকানা লেখা (পিন কোড, রাজ্যের উল্লেখসহ) ১০ টাকার ডাকটিকিটযুক্ত খাম পাঠাতে হয়। অনুরোধ পাঠাতে হয় 'অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার অব এগ্‌জামিনেশনস, এগজামিনেশন সেকশন, এ. আই. আই. এম. এস., নয়াদিল্লি-১১০ ০২৯ ঠিকানায়।

ন্যাশনাল শুগার ইনস্টিটিউট (কল্যাণপুর, কানপুর-২০৮ ০১৭) এদেশে 'শুগার টেকনোলজি' বিষয়ে পঠনপাঠনের পীঠস্থান। আমাদের মতো কৃষিপ্রধান দেশে নিঃসন্দেহে 'শুগার টেকনোলজি কোর্স'-এর চাহিদা আছে। ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির দরখাস্ত চেয়ে ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন কোর্স ও ভর্তির যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করছি।

(১) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স ইন শুগার টেকনোলজি : এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্সসহ এগ্রিগেটে কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে বি. এস্‌সি পাশ করতে হবে অথবা ওই নম্বর পেয়ে 'কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং'-এ 'ব্যাচেলর ডিগ্রি কোর্স পাশ করতে হবে। তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নম্বরের হার কমপক্ষে ৪০ শতাংশ। আড়াই বছরের কোর্স। ভর্তি করা হবে লিখিত পরীক্ষার মেধাক্রম অনুসারে।

(২) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন শুগার এঞ্জিনিয়ারিং : 'মেকানিক্যাল' অথবা 'ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং'-এ স্নাতক হতে হবে। দেড় বছরের কোর্স। ভর্তি করা হবে লিখিত প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে।

(৩) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মেন্টেশন অ্যান্ড অ্যালকোহল টেকনোলজি : কেমিস্ট্রি বিষয়সহ বি. এস্‌সি পাশ করতে হবে। 'ডিস্টিলারি' অথবা 'ব্রুয়ারি' ক্ষেত্রে এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। এক বছর চার মাসের কোর্স।

চিঠিপত্রের উত্তর

❑ ***সুদীপ কর্মকার, সোনামুখী, বাঁকুড়া।***

তোমার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। বি. স্ট্যাট কোর্সে ভর্তির খবর আমরা ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছি, নিশ্চয়ই দেখেছ।

❑ ***তিথি নন্দী, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা***

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্নালিজমে এম.এ কোর্স পড়ানো হয়। যে-কোনও শাখার অনার্স স্নাতক এই কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রার্থী মনোনয়নের জন্য ভর্তির লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়।

❑ ***অজয়বরণ ধাঁক, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া***

কলকাতার মৌলানা আজাদ কলেজে (রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড), তফসিলি প্রার্থীদের ডব্লিউ. বি. সি. এস. পরীক্ষার উপযোগী প্রশিক্ষণকেন্দ্র আছে।

❑ ***হিতাংশু বিশ্বাস, দুর্গানগর***

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্নালিজম পড়ার সুযোগ আছে। তা ছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অ্যাডাল্ট কন্টিনিউইং এডুকেশন সেন্টার'-এ 'মাস কমিউনিকেশন'-এ এক বছরের কোর্স পড়ানো হয়। সল্টলেকের ভবন'স কলেজেও জার্নালিজমে ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয়।

❑ ***সুমনা চট্টোপাধ্যায়, নয়াসরাই, হুগলি।***

নয়াদিল্লির 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব মাস কমিউনিকেশন'-এ ইংরেজি, হিন্দি জার্নালিজমে ডিপ্লোমা কোর্স করানো হয়। প্রার্থী মনোনয়ন করা হয় সর্বভারতীয় লিখিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে। প্রস্তুতির জন্য ইংরেজি ভাষার ওপর দখলের সঙ্গে-সঙ্গে ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভূগোল, অর্থনীতি, রাজনীতি বিষয়েও সাধারণ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। বিশ্লেষণাত্মক ও যুক্তিগ্রাহ্য পরিমিত উপস্থাপনার বিষয়ে লক্ষ রাখা দরকার। বিজ্ঞান সাংবাদিকতা বিষয়ে কলকাতা সায়েন্স কলেজে (রাজাবাজার ক্যাম্পাসে) প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ আছে।

❑ ***প্রশান্ত মিত্র, বরানগর ; পারমিতা মিত্র, কলকাতা-৭ ; সব্যসাচী ঘোষ, বেলঘরিয়া।***

আপনারা সকলেই ১৯৯৯ সালের 'ডব্লিউ. বি.সি.এস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা' প্রবর্তন বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এই পরীক্ষা চালু করতে চলেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি মিঃ জি. সি. সিনহা জানিয়েছেন, আই. এ. এস. প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ধাঁচে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে। মোটামুটি ঠিক হয়েছে, মোট দু'শো নম্বরের মধ্যে একটি পেপারে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে। সময় তিন ঘণ্টা। 'আই. এ. এস. প্রিলি'-র মতো 'অপশনাল' বিষয়ে 'পেপার' থাকবে না। যেসব বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে সেসব বিষয় হল— 'ইংলিশ কম্পোজিশন', 'ইনফরমেশন অন জেনারেল সায়েন্স', 'ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি', 'ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফি', 'ইন্ডিয়ান পলিটি অ্যান্ড ইকনমি,' 'জেনারেল নলেজ অন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স', 'জেনারেল অ্যান্ড মেন্টাল এবিলিটি', 'অ্যারিথমেটিক্' ইত্যাদি। প্রশ্ন করা হবে 'অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েস' ধরনের। তিনি আরও জানালেন, এই নতুন প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্পর্কে অচিরেই সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রার্থীদের বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে দেওয়া হবে।

অমর দাশ

(৪) সার্টিফিকেট কোর্স ইন শুগার এঞ্জিনিয়ারিং : মেকানিক্যাল অথবা ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা থাকতে হবে। কাজের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

আবেদন করবেন কীভাবে : ডিরেক্টর, ন্যাশনাল শুগার ইনস্টিটিউট-এর ঠিকানায় ৪৫ টাকার 'মানি অর্ডার' পাঠালে ফর্ম ও প্রসপেক্টাস ডাকযোগে সংগ্রহ করা যায়। মানি অর্ডার কুপনে ইংরেজি বড় হরফে সঠিকভাবে প্রার্থীর নাম-ঠিকানা উল্লেখ করতে হয়।

প্রয়োজনীয় তথ্য : শুগার টেকনোলজি ও শুগার এঞ্জিনিয়ারিং কোস -এ ভর্তির জন্য লিখি পরীক্ষা নেওয়া হবে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ। পরীক্ষাকেন্দ্র থাকছে কানপুর, দিল্লি, কলকাতা এবং চেন্নাই শহরে। লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের 'ইন্টারভিউ' হবে জুলাই মাসে কানপুরে। শুগার টেকনোলজি কোর্সের প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স বিষয় ; ১০০ নম্বরের মধ্যে তিন ঘণ্টার পরীক্ষা। প্রশ্নের মান হবে বি. এস্‌সির মতো শুগার এঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল

(এর পরে ৬০ পাতায়)

ডাঃ রিক মর্গান
ডাঃ মর্গান, খুব সতর্ক থাকবেন।
অবশ্যই। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি না ফিরলে ...
পুলিশে খবর দেবেন।
এমন চালাকচতুর লোক কেন যে নেশা করেন।
মাদকের নেশায় বাবুর কী অবস্থা দ্যাখো, মার্টি। লোকটা গেছে।
এরা যেমন, এদের এমনই হওয়া উচিত।
খরচের খাতায় আবার এক খদ্দের।
লক্ষ রাখো ... আমি গাড়িটা ঘুরিয়ে আনছি।
ইতিমধ্যে
ক্রি-রিং-রিং
ক্রি-রিং-রিং
কেউই নেই?
ওয়েল্‌সকে পেল নাকি!
6-22

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

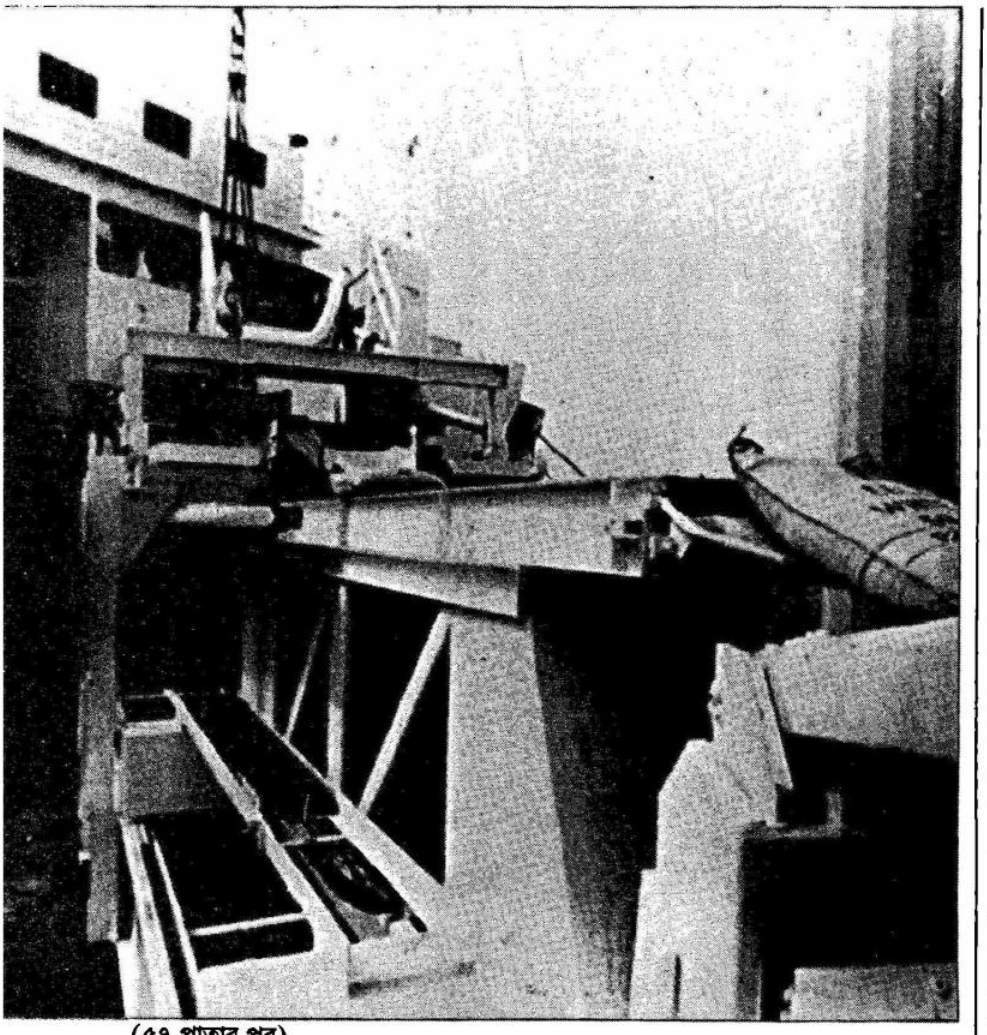

(৫৭ পাতার পর)

এঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে। **পূরণ করা ফর্ম পাঠাবেন** অবশ্যই রেজিস্টার্ড (প্রাপ্তিপত্রসহ) ডাকযোগে ডিরেক্টরের ঠিকানায়।

আবেদনের শেষ তারিখ : ২৫ মে '৯৮।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (কো-অপারেশন) কোর্স।

পড়াচ্ছে : বৈকুণ্ঠ মেহতা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট, ইউনিভার্সিটি রোড, পুনে-৪১১ ০০৭।

আবশ্যিক শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে-কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট/ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হতে হবে এবং কমপক্ষে ৫০ শতাংশ (তফসিলি ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে।

কীভাবে আবেদন করবেন : ডিরেক্টর, ভি. এ. এম. এন. আই. সি. ও. এম,পুনের অনুকূলে পুনের যে-কোনও ব্যাঙ্কের ওপর কাটা ২১৫ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট পাঠালে ডাকযোগে প্রয়োজনীয় ফর্ম ও প্রসপেক্টাস সংগ্রহ করা যাবে।

প্রয়োজনীয় তথ্য : 'জি-ম্যাট' ধাঁচের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে বাঙ্গালোর, পটনা, নয়াদিল্লি, পুনে শহরে। লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের 'গ্রুপ ডিসকাশন' ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'স্কলারশিপ'-এর ব্যবস্থা আছে।

আবেদনের শেষ তারিখ : বিদেশের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১৫ জুন '৯৮।

অ্যাসোশিয়েটশিপ ইন ইনফরমেশন সায়েন্স কোর্স

পড়াচ্ছে : ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টেশন সেন্টার', ১৪ সৎসঙ্গ বিহার মার্গ, নয়াদিল্লি-১১০ ০৬৭।

আবশ্যিক শিক্ষাগত যোগ্যতা : দ্বিতীয় শ্রেণীর 'মাস্টার্স ডিগ্রি' অথবা 'বি. ই.' অথবা 'এম. বি. বি. এস.' অথবা 'বি. লিব সায়েন্স'। সেইসঙ্গে এক্ষেত্রে তিন বছর কাজের অভিজ্ঞতা।

কীভাবে আবেদন করবেন : 'ডিরেক্টর, আই এন এস ডি ও সি' অনুকূলে নয়াদিল্লির কোনও ব্যাঙ্কের ওপর কাটা ১০০ টাকার ড্রাফ্ট এবং নাম-ঠিকানা লেখা ২৫ × ২০ সেন্টিমিটার মাপের আট টাকার ডাকটিকিটযুক্ত খাম পাঠালে ফর্ম ও প্রসপেক্টাস সংগ্রহ করা যাবে।

প্রয়োজনীয় তথ্য : প্রবেশিকা পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের ভিত্তিতে ২৫ জন প্রার্থী মনোনয়ন করা হবে। স্পনসর্ড নয় এমন কিছু মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ দেওয়া হবে। এটি দু'বছর মেয়াদের কোর্স এবং 'লাইব্রেরি' ও 'ইনফরমেশন সায়েন্স'-এ মাস্টার্স ডিগ্রির সমতুল।

আবেদনের শেষ তারিখ : ২৫ মে '৯৮।

কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস পরীক্ষা, (অক্টোবর '৯৮)

পরিচালনায় : ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন

ঢোলপুর হাউস, নয়াদিল্লি-১১০ ০১১।

যেসব কোর্সে ভর্তির জন্য এই পরীক্ষা : ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি, দেরাদুনের ১০৭ তম কোর্স ; 'এয়ার ফোর্স কোর্স' ; 'অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি', চেন্নাইয়ের ৭০ তম এস. এস্‌সি কোর্স।

আবশ্যিক শিক্ষাগত যোগ্যতা : আই. এম. এ. এবং ও. টি. এ. কোর্সের জন্য যে-কোনও শাখার স্নাতক হতে হবে ; এ. এফ. এ. কোর্সের জন্য ফিজিক্স/ ম্যাথমেটিক্স সহ বি. এস্‌সি. পাশ করতে হবে অথবা বি. ই. হতে হবে।

বয়স : আই. এম. এ. কোর্সের প্রার্থীদের জন্ম তারিখ হতে হবে ২ জুলাই,'৭৫ থেকে ১ জুলাই '৮০-এর মধ্যে ; এ. এফ. এ. প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২ জুলাই '৭৬ থেকে ১ জুলাই,'৮০-এর মধ্যে ; ও. টি. এ. প্রার্থীর ক্ষেত্রে ২ জুলাই '৭৪ থেকে ১ জুলাই,'৮০-এর মধ্যে।

প্রয়োজনীয় তথ্য : নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদন করতে হবে। এজন্য বিভিন্ন সংবাদপত্রে ৪ এপ্রিল বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছে। পরীক্ষার ফি ৩৫ টাকা ; জমা দিতে হবে 'সেন্ট্রাল রিক্রুটমেন্ট ফি স্ট্যাম্প'-এ। কলকাতাসহ ৩৯টি শহরে পরীক্ষা নেওয়া হবে। এয়ার ফোর্স ও আই. এম. এ. কোর্সের ক্ষেত্রে ইংরেজি, সাধারণ জ্ঞান, গণিত বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে। ও. টি. এ-এর ক্ষেত্রে নেওয়া হবে ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা।

আবেদনের শেষ তারিখ : প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্য ২৫ মে '৯৮।

অমর দাশ

খরগোশের গর্ত খুঁজতেও উপগ্রহ

খরগোশের তৈরি সুড়ঙ্গ-পথ খুঁজে বের করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে উপগ্রহ। চমকপ্রদ এই উদ্যোগ সম্পর্কে জানিয়েছেন শমিতা চট্টোপাধ্যায়

অনেক বছর ধরে বন্দি থাকার পর একদল মানুষ বুদ্ধিপরামর্শ করে তৈরি করলে এক বিরাট সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ-পথ ধরে তারা বেরিয়ে এল বাইরের মুক্ত আলোয়....এটা একটা বিদেশি ছবির গল্প। কিন্তু আমাদের অনেকেরই জানা নেই সুড়ঙ্গ তৈরি করতে এক খুদে প্রাণীও রীতিমত দক্ষ। প্রাণীটি হল খরগোশ। ওই তুলতুলে নরম, ছোট্ট জীবটি মাটি পছন্দ হলেই সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ তৈরি করে ফেলে। আবার এক সুড়ঙ্গের সঙ্গে অন্য সুড়ঙ্গের যোগাযোগও থাকে! এখন তাদের এই কীর্তি যদি মানুষের কাজে বাধা হয়, মানুষ কি তাদের ছেড়ে দেবে? একেবারেই না। খরগোশদের তৈরি এই সুড়ঙ্গ খুঁজে বের করার জন্য মানুষ এখন আবিষ্কার করেছে এক অভিনব উপায়। উপগ্রহকে তারা ব্যবহার করছে এই সুড়ঙ্গ-সন্ধান-অভিযানে।

একসময় দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার 'ফ্লাইন্ডারস ন্যাশনাল পার্ক'-এ খরগোশের তৈরি সুড়ঙ্গ খুঁজে বের করতে রেঞ্জারদের রীতিমত হিমশিম খেতে হত। এখন তাঁদের সাহায্য করার জন্য আছে 'ডিফারেনশিয়াল গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম' (ডি. জি. পি. এস.)। জি. পি. এস. উপগ্রহ পৃথিবীর উপরিতলের কোনও কিছুর অবস্থান নির্দেশ করতে পারে। তবে খরগোশের গর্ত খুঁজে বের করার জন্য এর ব্যবহার সম্ভবত পৃথিবীতে এই প্রথম।

পার্কের ভেতরে খরগোশ কোথায় গর্ত খুঁড়ল, গর্তটা কী অবস্থায় আছে, এসব খবর রাখা রেঞ্জারদের কাজের মধ্যেই পড়ে। আগে এই শ'য়ে শ'য়ে সুড়ঙ্গ খুঁজে বের করার জন্য তাঁরা ব্যবহার করতেন এক ধরনের ছুঁচলো-মুখ মোটা লাঠি। তারপর তাঁরা ম্যাপে সেগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করতেন। প্রথমত, কাজটা যথেষ্ট কঠিন। তার চেয়েও বড় কথা, দ্বিতীয়বার গর্ত খুঁজে বের করতে শুধু ম্যাপ আর কম্পাসই যথেষ্ট নয়। এক কথায় কাজটা বেশ দুরূহ। এখন রেঞ্জারদের জন্য আছে এ. টি. ভি.—'অল-টেরেন ভেহিক্‌ল'—যে গাড়ি যে-কোনও অঞ্চলে যেতে পারে। রেঞ্জাররা এখন একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার নিয়ে এ. টি. ভি.-তে চেপে বসেন। এখানে বসেই তাঁরা উপগ্রহ থেকে সমস্ত খবর পেতে থাকেন। যখন তাঁরা কোনও সুড়ঙ্গের কাছে এসে পৌঁছন, তখন সংশ্লিষ্ট সব তথ্য জি পি. এসের সাহায্যে কম্পিউটারে চলে আসে। খরগোশের গর্ত খুঁজে পাওয়া যে এখন অনেক সহজতর হয়ে গেছে, তা 'প্রোজেক্ট অফিসার' ডেভিড পিকক নিজেই মনে করেন এ. টি. ভি-তে চড়ে কম্পিউটারের পরদায় গর্তের অবস্থান দেখতে পেলেই তো কাজ এগিয়ে গেল। তারপরের কাজ হল, পার্কের হেড কোয়ার্টারে গিয়ে মূল কম্পিউটারে সেই সমস্ত তথ্য 'ডাউন লোড' করা। এখানেই তথ্যের বিশ্লেষণ হয়।

গর্তের আয়তন থেকে মাটির ধরন পর্যন্ত সমস্ত জানা যায় এভাবে। এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সুবিধের দিক হল, এখন রেঞ্জাররা যখন খুশি গর্ত সম্পর্কে পাওয়া আগের তথ্যের সঙ্গে সাম্প্রতিক তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারেন। তা ছাড়া আগে প্রতিটি গর্ত নির্দেশ করতে যে 'স্টেক' বা বিশেষ ধরনের লাঠি ব্যবহার করা হত, তার জন্য খরচ হত বিশাল। এখন সেই খরচটিও কমানো যাচ্ছে।

জি. পি. এস-কে এই কাজে লাগানোর ব্যাপারে যাঁর কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, তিনি অ্যাডিলেড-এর সার্ভেয়ার মার্ক লেথব্রিজ। তিনি এমন একটা পদ্ধতি বের করেছেন, যাতে জি. পি. এসের দেওয়া তথ্য আরও সংস্কার করা যায়। এই পুরো ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য পার্কের নির্দিষ্ট জায়গায় আছে সৌরশক্তিসম্পন্ন জি. পি. এস.-বেস-স্টেশন। ডেভিড পিকক বলেছেন, জি. পি. এসের সাহায্যে পার্কের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বের করা যাবে। যেমন, জানা যাবে কোনও দুর্লভ গাছের চারা গজাল কি না, কিংবা কোনও বিশেষ প্রাণী দেখা দিল কি না। মোট কথা, উপগ্রহ-প্রযুক্তিকে খরগোশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়া সত্যিই চমকপ্রদ এক ঘটনা।

গাবলু
পপকর্নে বিশেষ ছাড়
পপ কর্ন
গাবলু

কাছে-দূরে

ইতিহাসের সাক্ষী

কলকাতা থেকে মাত্র ১৪০ কি.মি. দূরে, মেদিনীপুর শহরের খুব কাছে শান্ত, নিরিবিলি গ্রাম কর্ণগড়। অথচ এই গ্রামেই রয়ে গেছে এক জীবন্ত ইতিহাসের আশ্চর্য দলিল। লিখেছেন জগন্নাথ ঘোষ

দেবী মহামায়ার বিগ্রহ

হয়ে আছে কর্ণগড়

কর্ণগড় মন্দিরের প্রবেশদ্বার যোগীখোপ

ভাদুতলার মোড় থেকে চারটি রাস্তা চার দিকে ছড়ানো। পশ্চিমে ভীমপুর হয়ে লালগড়, দক্ষিণে রয়ে গেল মেদিনীপুর শহর, উত্তরে গেছে শালবনি ছুঁয়ে গড়বেতা আর পূর্বে চার কি. মি. দূরত্বে কর্ণগড়। মেদিনীপুর সদর থেকে ৮ কি. মি. দূরে ভাদুতলা। মাঝে পড়বে আবাসগড়। ভাদুতলা থেকে কর্ণগড় যাওয়ার পথটুকু মোরাম ঢালা আর মাঝখানে দুটি গ্রাম বালিজুড়ি এবং ডাঙরপাড়া। দুটিই পথের দক্ষিণে। আর

উত্তরে পাথর চট্টান, রুক্ষ প্রান্তর, সরকারি ব্যবস্থায় কনসৃজন। সব ছাপিয়ে ধু-ধু লাল প্রান্তর ছড়িয়ে পড়েছে দূরের নীল আকাশের সীমান্তে। মাঝখানের এই কাঁচা পথ বাঁকে বাঁকে এগিয়ে চলেছে কর্ণগড়ের মহামায়া মন্দিরের দিকে। অথচ আজ থেকে সাড়ে ৪০০ বছর পিছিয়ে গেলে এই প্রস্তরভূমি পিয়াশাল, বহেড়া, গামারে জটিল অরণ্য রচনা করেছিল। দিনদুপুরেও এ-পথে ভাদুতলায় যাতায়াত ছিল না। তার একটাই কারণ, দুষ্কৃতীরা পথিক দেখলেই পাবড়া চালাত, তারপর যথাসর্বস্ব লুঠ করে তাকে পাবড়ার আঘাতে ঘায়েল করে লুঠেরারা পালিয়ে যেত পারাং নদী পার হয়ে আনন্দপুর। এক সময় মানুষের বসতি বাড়ল এদিকে এবং কমতে লাগল জঙ্গলের গাছপালা। সূর্যের তীব্র আলোয় মাটি শুকিয়ে পাথর, ফসল শুকিয়ে আংরা আর নিরন্ন মানুষের ঘরে ত্রাস। তবুও হঠাৎ করে এসে পড়া পর্যটকের কাছে এ-পথের ভ্রমণ বেশ আরামদায়ক।

কর্ণগড়ের গুরুত্ব দুটি কারণে। প্রথমটি মন্দিরের স্থাপত্য, রাজারাজড়ার ইতিহাস এবং তাঁদের শৌর্যের কাহিনী, আর দ্বিতীয়টি মেদিনীপুরে পাইক বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল এই কর্ণগড়ে। সেই পাইক এবং চুয়াড় বিদ্রোহে সাধারণ মানুষ থেকে রানি শিরোমণি সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ব্রিটিশের ওপর। আর আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে, ১৭৯৯ সালে সেই বিদ্রোহের বেদনাদায়ক পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। সে কাহিনী জানতে হলে একটু ইতিহাস ছুঁয়ে দেখতে হয়, চলে যেতে হয় ৪৩০ বছর অতীতে।

১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা লক্ষ্মণ সিংহ কর্ণগড়ে তাঁর রাজপ্রাসাদ গড়ে তোলেন। তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয় মেদিনীপুর সদর থেকে আবাসগড়, কর্ণগড় পেরিয়ে আনন্দপুর পর্যন্ত। সদর মহল আর অন্দর মহল জুড়ে তাঁর যে বিপুল আয়তনের রাজপ্রাসাদ ছিল, এই কর্ণগড় সেই সদর মহলের অন্তর্ভূত এবং আজও অক্ষত, কিন্তু অন্দর মহলের ধ্বংসস্তূপ প্রায় দু' মাইল দূরত্বে অবহেলিত এবং উপেক্ষিত। কর্ণগড়ের মন্দির টিকে থাকার মূলে অবশ্য রাজা যশোবন্ত সিংহ। তিনিই মন্দিরটি সংস্কার করেন প্রায় ৩০০ বছর আগে। এই যশোবন্ত সিংহ লক্ষ্মণ সিংহের উত্তরপুরুষ, আঠারো শতকের গোড়ার দিকে তিনি কর্ণগড়ের সিংহাসনে বসেন, অর্থাৎ শ্যাম সিংহ এবং রাম সিংহর পরবর্তী রাজা তিনিই। তাঁর পর ১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে রাজা অজিত সিংহর হাতে যায় কর্ণগড়ের দায়িত্ব। অপুত্রক অজিত সিংহর মৃত্যুর পর দুই রানি, ভবানি এবং শিরোমণি কর্ণগড়ের ভার নেন। ১৭৬০ সালে ভবানীর মৃত্যু হলে শিরোমণি কর্ণগড়ের নিরঙ্কুশ ভার পান। রানির দায়িত্ব পাওয়ার পরই তাঁকে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সবচেয়ে জটিল সমস্যাটি ছিল পাইক বিদ্রোহ। এই পাইক বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল ১৭৬০ সালে, যখন ইংরেজ সরকার মিরজাফরকে সরিয়ে দিয়ে মিরকাশিমকে নবাব নিযুক্ত করলেন। মিরকাশিম কৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হিসেবে বাংলার তিন জেলা ইংরেজ বাহাদুরকে উপঢৌকন দিলেন। ওই তিন জেলা অর্থাৎ মেদিনীপুরের অংশ (মেদিনীপুরের অন্য অংশ কাঁথি তখন বর্গিদের দখলে), বর্ধমান এবং চট্টগ্রাম। বাংলাদেশের সমস্ত রাজস্বের এক- তৃতীয়াংশ এই জেলাগুলি থেকে পাওয়া যেত। আরও বেশি খাজনার লোভে মেদিনীপুরের কালেক্টর পাইকদের ওপর নতুন কর ধার্য করলেন এবং বরখাস্ত করলেন পুরনো পাইকদের। ইংরেজরা মনে করেছিলেন, এর ফলে পাইকদের অসন্তোষ মাথাচাড়া দিতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, পাইক, লায়েক এবং ঘাটোয়াল সর্দারদের অবাধ ভূমি দখলের বিরুদ্ধে তাঁরা জারি করলেন নিষেধাজ্ঞা। তৃতীয়ত, অরণ্যের অধিকার ইংরেজরা ওঁদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন। এই ত্রিমুখী আক্রমণের জন্য পাইক, লায়েক, ঘাটোয়ালরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ক্ষোভে ফেটে পড়ে বন্ধ করে দিলেন খাজনা দেওয়া। বালিজুড়ি,আবাস, কর্ণগড়েও ছড়িয়ে পড়তে থাকল ক্ষোভ। তীর-ধনুক, মশাল নিয়ে পাইকরা যখন আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছেন,ওদিকে ইংরেজ শাসকরাও পালটা আঘাত হানবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। কিন্তু বাংলার পথঘাট অরণ্য তাঁদের অচেনা থাকায় এবং দেশীয় অস্ত্রের ব্যবহার না জানার ফলে ইংরেজ সৈন্যরা মরতে লাগলেন। দিকে দিকে তখন আগুন জ্বলছে, পুলিশ-চৌকি ভস্মীভূত হচ্ছে। এর ওপর রানি শিরোমণির রাজ্যের ওপর মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কর ধার্য জনরোষে ইন্ধন জোগাল। রানিও বিদ্রোহে শামিল হলেন। ১৭৭৪ সাল। পাইক-বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল কর্ণগড় থেকে বাহাদুরপুর, আবাস থেকে শালবনি, আনন্দপুর থেকে গড়বেতা। বিদ্রোহীদের সদর কার্যালয় হল আবাসগড়। এদিকে নাড়াজোলের রাজাও রানির পক্ষে যোগ দিতে এসেছেন। মেদিনীপুরের পূর্ণ কর্তৃত্বের আশ্বাস পেয়ে যুগলচরণ অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করে দিলেন। একটা বিদ্রোহে ফাটল ধরল। নেতারা

কর্ণগড় মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগ

ধরা পড়লেন যুগলচরণের বিশ্বাসঘাতকতায়। রানি শিরোমণি আবাসগড়েই বন্দি হলেন। ১৭৯৯, ৬ এপ্রিল একটি বিদ্রোহের মর্মান্তিক মৃত্যু হল। পলায়মান বিদ্রোহীদের ধরে এনে মেদিনীপুর কেল্লার মাঠে, পুরনো জেলখানার ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে হত্যা করা হল। কত যুবক, শিশু আর বৃদ্ধকে যে আগুনে পুড়িয়ে মারা হল, তার হিসেব নেই। ভাদুতলা, আবাস, কর্ণগড় অঞ্চলগুলি পরিণত হল শ্মশানভূমিতে। মানুষের সেই ব্যর্থ প্রচেষ্টা, মৃত্যু আর সেই দুঃস্বপ্নের বয়স এখন ২০০ বছর হয়ে গেল ! কর্ণগড়ের মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে পথিক নাকি স্তব্ধ রাত্রিতে শুনতে পান আর্তের চিৎকার আর শিশুর কান্না। স্থানীয় মানুষ বলেন ওই গুমঘর থেকে তৃষ্ণার্ত মানুষের জলের জন্য হাহাকার শোনা যায়। অথচ গুমঘর হয়তো কোনওদিনই চোখে পড়বে না। কর্ণগড় অঞ্চলের মানুষ তাঁদের বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে দূর অতীতকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন এভাবেই।

কর্ণগড় মন্দিরের প্রবেশদ্বারের নাম যোগীখোপ। এই দ্বার প্রায় ৩০ ফুট উঁচু। তার ওপরে ছিল নজরখানা। সান্ত্রিরা তার ওপরে বসে শত্রুদের গতিবিধির দিকে নজর রাখতেন। যোগীখোপ দিয়ে ঢুকলেই সামনে দুই দেউল, একটি খগেশ্বরজিউর (বাঁ দিকে), অন্যটি মহামায়ার। দুটিই রেখ দেউলের রীতিতে তৈরি এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট। দুই দেউলের সামনেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। মন্দির প্রাঙ্গণে দুধকুন্ডটি স্থানীয় মানুষের গ্রীষ্মে একমাত্র জলের উৎস। তার পাশে আছে একটি রুধির পাত্র। দুর্গাপূজার অষ্টমীতে মহামায়ার পূজা উপলক্ষে ছাগবলি হয় এবং বলির রক্ত ওই রুধির পাত্রে ঢেলে দেবীকে নিবেদন করা হয়। স্থানীয় অনেক মানুষ মনে করেন, দেবী মহামায়া রক্তপিপাসু। মন্দির প্রাঙ্গণের বাইরে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের সমাধি আছে। এই রামেশ্বর চেতুয়া-বরদার জমিদার হিম্মত সিংহর অত্যাচারে নিজ বাসভূমি ঘাটাল ছেড়ে চলে আসেন এবং রাজা যশোবন্ত সিংহর সভাকবি নিযুক্ত হন। এখানে বসেই তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'শিবায়ন' রচিত হয়। এখন কর্ণগড় মন্দিরের সমস্ত দায়িত্ব নাড়াজোলের রাজার উত্তরসুরির ওপর ন্যস্ত।

মন্দিরের উত্তরে আকাশমণির ছায়ায়-ছায়ায় ঢাকা কর্ণগড় গ্রাম। নিরিবিলি এবং শান্ত এখানকার মানুষজনের জীবনযাপনও কলরবহীন এবং নিস্তরঙ্গ। অথচ এ-গ্রামেই রয়ে গেছে প্রায় সাড়ে ৪০০ বছরের প্রাচীন ইতিহাসের দলিল। ২০০ বছর আগে যে পাইকদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই হয়েছিল ইংরেজরা তাঁদের নাম দিয়েছিলেন চুয়াড়। তাই ওঁদের বিদ্রোহের নাম হয়েছিল চুয়াড় বিদ্রোহ। ওই অসমসাহসী পাইকদের বীরত্বের কাহিনীতে কর্ণগড়ের উষর ভূমি আজও মুখর হয়ে আছে। আর দেবী মহামায়াও জাগ্রত হয়ে আছেন কর্ণগড়ের মানুষের হৃদয়ে, শ্রদ্ধায় এবং বিশ্বাসে।

মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এ স্থান পেতে পারতেন রানি শিরোমণি

সেই সময়ের ইংরেজদের সামরিক শক্তি ও মহাজনদের অর্থনৈতিক অত্যাচার জঙ্গল মহালের গরিব কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। উল্লেখযোগ্য নেতৃত্বে ছিলেন কর্ণগড়ের রানি শিরোমণি। বিধবা রানি ওই সময় ওই মন্দিরেই থাকতেন এবং এখান থেকেই নেতৃত্ব দিতেন। তিনি যথার্থই বীরাঙ্গনা। শেষপর্যন্ত অবশ্য তিনি ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে যান এবং তাঁকে বন্দি করা হয়। তবু কর্ণগড় রানি শিরোমণির সেই তেজোদীপ্ত মহিমার ইতিহাস এখনও বহন করে চলেছে।

কীভাবে যেতে হবে

মেদিনীপুর সদর থেকে আট কিলোমিটার দূরে ভাদুতলা। মাঝে পড়বে আবাসগড়। ভাদুতলার মোড় থেকে চারটি রাস্তা চারদিকে ছড়ানো। পশ্চিমে ভীমপুর হয়ে লালগড়, দক্ষিণে রয়ে গেল মেদিনীপুর শহর, উত্তরে গেছে শালবনি ছুঁয়ে গড়বেতা আর পূর্বে চার কিলোমিটার দূরত্বে কর্ণগড়। ভাদুতলা থেকে কর্ণগড় যাওয়ার মোরাম-ঢালা পথ ছবির মতো সুন্দর।

কবি রামেশ্বরের পঞ্চমুণ্ডির আসন আরও এক দ্রষ্টব্য

'শিবায়ন' কাব্যের স্রষ্টা রামেশ্বর চক্রবর্তীর আদি বাড়ি ছিল বরদা পরগনার যদুপুর গ্রামে। হিম্মৎ সিংহ নামে জমিদার তাঁর ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দেওয়ায় তাঁকে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল। সে-সময় তাঁকে আশ্রয় দেন কর্ণগড়ের রাজা রাম সিংহ।

"পূর্ববাস যদুপুরে হেমৎ সিং ভাঙ্গে যারে
রাজা রাম সিংহ কৈল প্রীত।"

রাজা রামসিংহের সভাসদ ও পুরাণ-পাঠক ছিলেন কবি। তিনি রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত মহামায়া ও অভয়ার মন্দিরের পূজারী তন্ত্রসাধকের কাছে দীক্ষা নিয়ে এই পঞ্চমুণ্ডির আসনে সাধনা করেন।

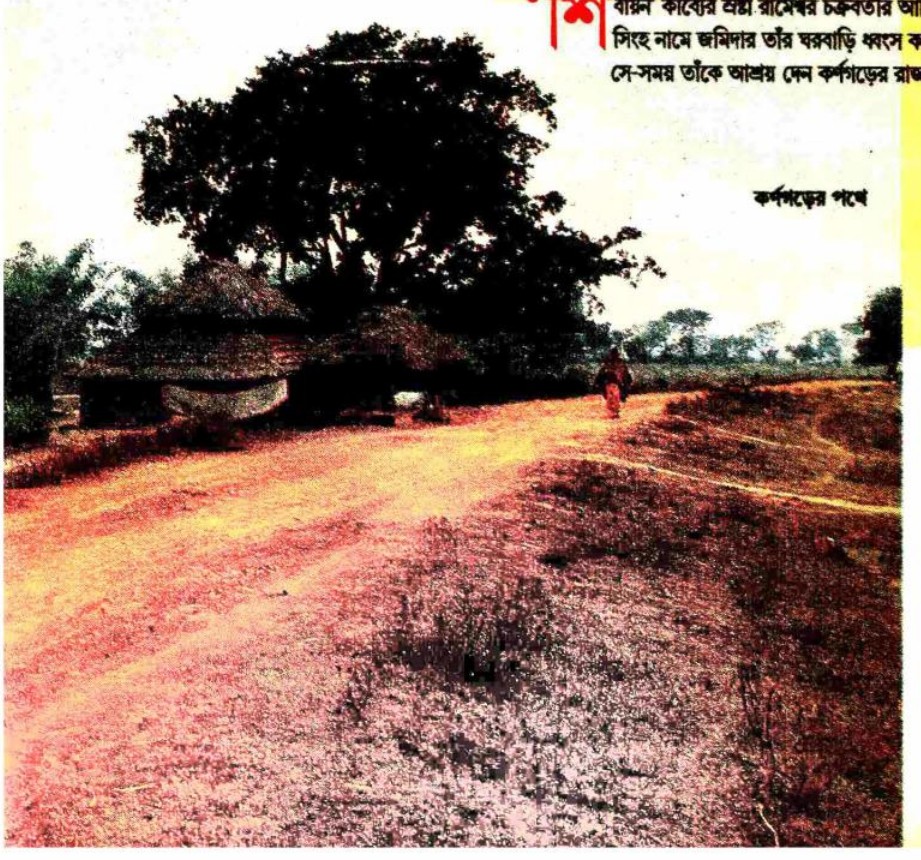

কর্ণগড়ের পথে

ফোটো : অমরনাথ চন্দ্র

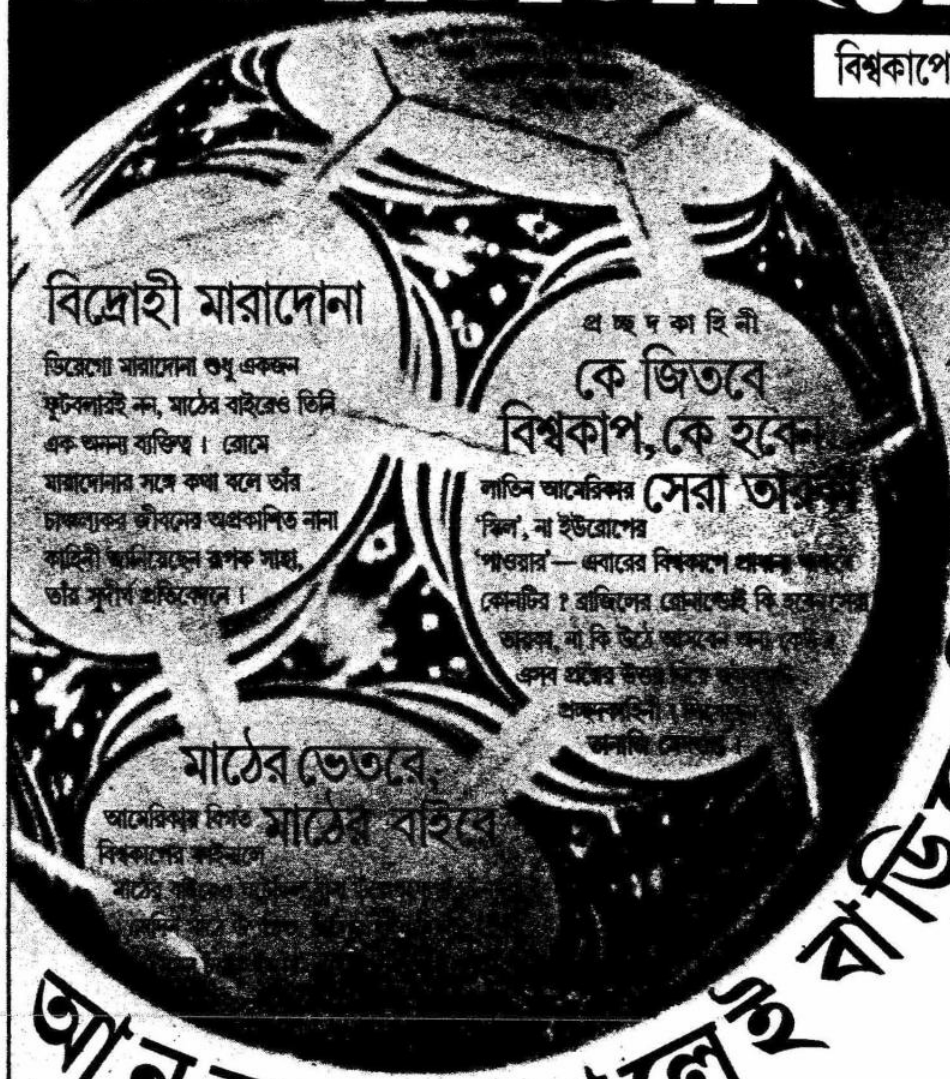

৩ জুন ১৯৯৮
আনন্দমেলা
বিশ্বকাপের তারকাদের রঙিন পোস্টার
বিদ্রোহী মারাদোনা
ডিয়েগো মারাদোনা শুধু একজন ফুটবলারই নন, মাঠের বাইরেও তিনি এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। রোমে মারাদোনার সঙ্গে কথা বলে তাঁর চাঞ্চল্যকর জীবনের অপ্রকাশিত নানা কাহিনী শুনিয়েছেন রূপক সাহা, তাঁর সুদীর্ঘ প্রতিবেদনে।
প্র চ্ছ দ কা হি নী
কে জিতবে বিশ্বকাপ, কে হবেন
লাতিন আমেরিকার সেরা তারকা
'স্কিল', না ইউরোপের
মাঠের ভেতরে, মাঠের বাইরে
ফুটবল নিয়ে দুর্দান্ত তিনটি গল্প লিখেছেন বিমল কর, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও দিব্যেন্দু পালিত
তারকাদের ফুটবল
এবারের বিশ্বকাপ নিয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা কে কী বলছেন : লিখেছেন বাইচুং ভুটিয়া, হেমন্ত ডোরা, কৃশানু দে, পি. কে. ব্যানার্জি, অমল দত্ত, মিঠুন চক্রবর্তী, কুমার শানু ও আরও অনেকে।
■ বিশ্বকাপের দুর্দান্ত অসংখ্য ফোটোগ্রাফ, অজস্র পরিসংখ্যান ও অন্যান্য তথ্য
■ 'কোয়ালিফাইং রাউন্ড'-এর প্রতিটি ম্যাচের বিস্তারিত ফলাফল
■ প্রতিটি দেশের কোচদের 'স্ট্র্যাটেজি' নিয়ে আলোচনা
■ বিশ্বকাপের ইতিহাস : গত ১৫টি বিশ্বকাপের নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য।
আনন্দমেলা খুলেই বাড়িতে বিশ্বকাপ
আকর্ষণীয় পুরস্কার!
Coca-Cola
আনন্দমেলা
বিশেষ বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা
৩ জুন আনন্দমেলা বিশেষ সংখ্যায় প্রবেশপত্র পাওয়া যাবে
বিশ্বকাপ ফুটবল ১৯৯৮
বিশেষ সংখ্যা
মূল্য : তিরিশ টাকা

কুইজ

'টাইম' পত্রিকার ৭৫ বছর পূর্ণ হল

এই শতকের গুরুত্বপূর্ণ ও ঘটনাবহুল বছরগুলির সাক্ষী হয়ে আছে 'টাইম' পত্রিকা। এ-বছরের মার্চ মাসে ৭৫ বছর পূর্ণ হল এই পত্রিকার।

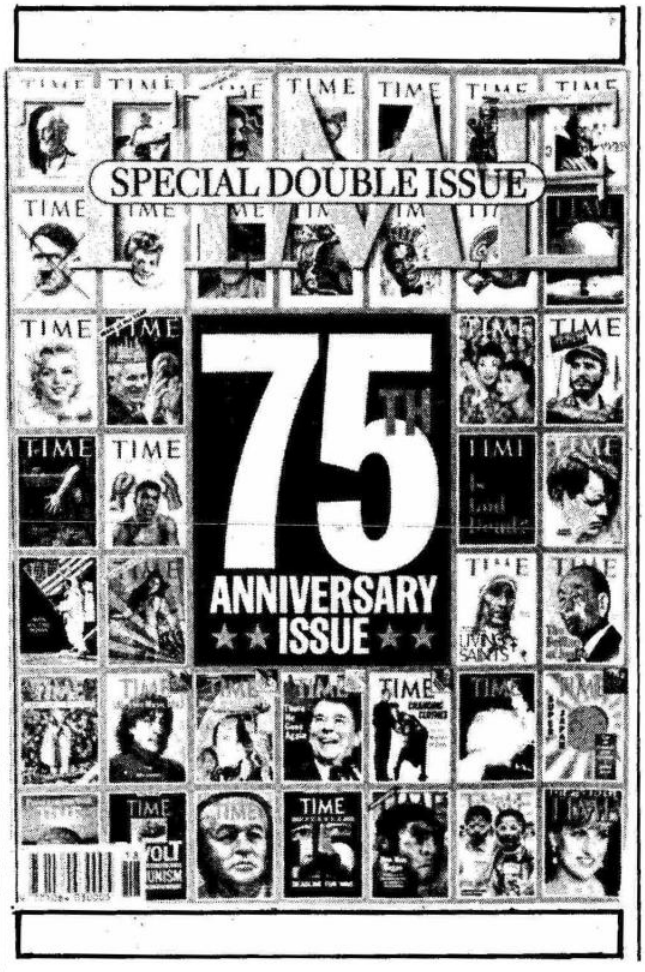

ইতিহাসের সবচেয়ে ঘটনাবহুল শতক হিসেবে যদি ধরা যায় বিশ শতককে, তবে তার সবচেয়ে ঘটনাবহুল ৭৫ বছরের সাক্ষী হল 'টাইম' পত্রিকা। সারা পৃথিবীর সবচেয়ে নামকরা পত্রিকাগুলির একটি এই 'টাইম'। এ-বছরের মার্চ মাসে ৭৫ বছর পূর্ণ হল পত্রিকাটির। ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় এই পত্রিকা। ব্রিটন হ্যাডেন এবং হেনরি লিউস ৯ ইস্ট ফর্টিয়েথ স্ট্রিট-এর ছোট অন্ধকার অফিসে বসে ৩২ পাতার যে সংখ্যাটি প্রকাশ করেছিলেন, কে জানত যে, ৭৫ বছর পরে সেটিই হয়ে উঠবে পৃথিবীর সেরা ম্যাগাজিনগুলির একটি!

কিছু-কিছু মানুষ থাকেন, যাঁরা ভালবাসেন স্বপ্ন দেখতে। এ কেবল আকাশকুসুম স্বপ্ন নয়। এমন মানুষ কেউ-কেউ থাকেন, যাঁরা একটি স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য সারা জীবন উৎসর্গ করে দেন। এমনই মানুষ ছিলেন ব্রিটন হ্যাডেন ও হেনরি লিউস। 'টাইম' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন ওঁরা নিতান্তই যুবক। হ্যাডেনের তখন বয়স ২৫ বছর, লিউসের ২৪। অভিজ্ঞতার অভাব ওঁদের স্বপ্ন দেখায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। অপরিসীম প্রাণশক্তি আর বড় কিছু করার আগ্রহ ওঁদের পথ দেখিয়েছিল।

তারপর অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। সারা পৃথিবী জুড়ে ঘটেছে নানা পট-পরিবর্তন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এগিয়ে গিয়েছে মেল ট্রেনের গতিতে, পালটেছে সামাজিক প্রেক্ষাপট, পালাবদল ঘটেছে রাজনৈতিক পরিস্থিতির, সমৃদ্ধ হয়েছে নানা দেশের সংস্কৃতি। সংবাদপত্রকে যদি মেনে নেওয়া হয় চলমান জীবনের আয়না বলে, পৃথিবীর চলমান ইতিহাসের নানা টুকরো ছবি ধরে রাখতে গিয়ে কখন যেন পালটে গিয়েছে সেই সংবাদপত্রও। আজ যদি 'টাইম' পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার পাতা ওলটাতে শুরু করেন কেউ, তবে গত ৭৫ বছরের স্মৃতির নানা ভাঙাচোরা টুকরো তাঁকে আচ্ছন্ন করবেই। এ-বছরের মে মাসে সেইসব স্মৃতিকে একত্র করে প্রকাশিত হয়েছে 'টাইম' পত্রিকার ৭৫তম বর্ষপূর্তি সংখ্যা। গত সাড়ে সাত দশকের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি যেভাবে ছাপা হয়েছিল 'টাইম'-এর বিভিন্ন সংখ্যায়, সেখান থেকে সেগুলির নির্বাচিত অংশ বেছে নিয়ে সঙ্কলন করা হয়েছে এখানে। এই সঙ্কলন কার্যত হয়ে উঠেছে গত ৭৫ বছরের ইতিহাসের এক প্রামাণ্য দলিল। বিশেষ এই সংখ্যাটির পাতা ওলটাতে-ওলটাতে মনে হবে, আপনি যেন দাঁড়িয়ে আছেন ইতিহাসের মুখোমুখি, শতাব্দীর শেষে পৌঁছে পেছন ফিরে দেখছেন ফেলে আসা সময়ের প্রধান ঘটনাগুলিকে। ১৯২৩ সালের মার্চ মাসের প্রথম সংখ্যাটির প্রচ্ছদকাহিনী ছিল মাত্রই এক কলামের, কিন্তু তার মধ্যেই ধরা পড়েছিল পত্রিকাটির নিজস্ব কণ্ঠস্বর।

গত ৭৫ বছরে অসংখ্য বিষয় উঠে এসেছে এই পত্রিকার প্রচ্ছদে। রাজকুমারী ডায়ানা, মাদার টেরিজা, জন লেনন থেকে শুরু করে চাঁদে মানুষের প্রথম পদার্পণ, উপসাগরীয় যুদ্ধ—সবই হয়ে উঠেছে প্রচ্ছদকাহিনীর বিষয়। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি' যেমন আছে, তেমনই আছেন মহাত্মা গাঁধী, আছে সুমো কুস্তির পাশাপাশি চার্লি চ্যাপলিনের 'সিটি লাইট্স', আছেন নর্তকী আনা পাভলোভা, আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পার্ল হারবার-এর পতনের কাহিনী, আছে হিরোশিমা-নাগাসাকির করুণ ইতিহাস, আছেন এলভিস প্রেসলি, ব্রুস লি, বিল গেট্স ও কুর্ট কোবেন। আছে আরও অনেক কিছুই। গত ৭৫ বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনার পাশেই জায়গা করে নিয়েছেন এই শতকের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বরা। সব মিলিয়ে প্রকৃত অর্থেই 'টাইম' পত্রিকার এই সংখ্যাটি হয়ে উঠেছে গত ৭৫ বছরের ইতিহাসের এক সংক্ষিপ্ত লেখচিত্র।

প্রশ্ন

(১) মেক্সিকো-র এক নোবেলজয়ী কবি ভারতবর্ষে রাষ্ট্রদূত হিসেবে এসেছিলেন। তাঁর নাম কী ?

সাধনকুমার প্রামাণিক, কুলগোড়া, পুরুলিয়া।

(২) কোন বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক লিখেছেন 'এ প্যাসেজ টু ইংল্যান্ড' বইটি ?

শ্রাবন্তী রায় ও চিরশ্রী রায়, মাথাভাঙা, কোচবিহার।

(৩) এখন যে দেশটির নাম জিম্বাবোয়ে, আগে সে-দেশটির কী নাম ছিল ?

শালবনী ঘোষ, কৃষ্ণনগর, নদিয়া।

(৪) 'প্রাচ্যের গ্রেট ব্রিটেন' বলা হয় কোন দেশকে ?

ইন্দ্রনীল চৌধুরী, বেলঘরিয়া হাই স্কুল, বেলঘরিয়া।

(৫) সবচেয়ে বেশিদিন ফল দেয় এমন একটি উদ্ভিদ হল নাশপাতি গাছ। কতদিন পর্যন্ত ?

অভীক বায়ড়ি, বরাভূম, পুরুলিয়া।

(৬) ফেলুদা-র গল্প নিয়ে টেলিভিশনের জন্য প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র তৈরি করেছিলেন সন্দীপ রায়।

কে এই অভিনেতা

ইনি লিখেছেন 'এ প্যাসেজ টু ইংল্যান্ড'

অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'সত্যজিৎ রায় প্রেজেন্ট্স'। ওই ছবিগুলিতে ফেলুদার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কে ?

শ্যামল সরকার, বেলগাছিয়া, কলকাতা।

(৭) মানুষের মহাকাশযাত্রার ইতিহাসে দুটি উল্লেখযোগ্য নাম 'অ্যাবেল' ও 'বেকার'। এরা কারা ?

সায়ন চট্টোপাধ্যায়, নবগ্রাম, হুগলি।

(৮) সদ্য সমাপ্ত ত্রিদেশীয় ক্রিকেট সিরিজে 'ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট' নির্বাচিত হয়েছেন ভারতের একজন ক্রিকেটার। কে তিনি ?

বৃন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, গল্‌ফ গ্রিন, কলকাতা।

(৯) কে লিখেছেন 'এ লং ওয়াক টু ফ্রিডম' বইটি ?

অভিষেক সেনগুপ্ত, কাঁথি, মেদিনীপুর।

(১০) আসন্ন বিশ্বকাপ ফুটবলের আসরে ফ্রান্সে মোট খেলা হবে ৬৪টি ম্যাচ। ক'টি স্টেডিয়ামে ?

বাবলু বসু, গাছতলা, কলকাতা।

(১১) পর্তুগালের মুদ্রার নাম কী ?

প্রিয়াঙ্কা দত্ত ও বিপ্লব দত্ত, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

(১২) স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বকে ব্রিটিশরা উল্লেখ করতেন 'দ্য ফাদার অব ইন্ডিয়ান আনরেস্ট' বলে ?

অভিরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর।

(১৩) এই শতকের সেরা তিনজন চলচ্চিত্র পরিচালকদের মধ্যে একজন অবশ্যই চার্লি চ্যাপলিন। তাঁর তৈরি প্রথম সবাক চলচ্চিত্র কোনটি ?

শ্রীমতী চন্দ্র, মৌড়ী, হাওড়া।

(১৪) 'ম্যাড কাউ ডিজিজ' রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেছিলেন এক মার্কিন বিজ্ঞানী। কে তিনি ?

অর্ণব মাইতি, পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর।

এই ক্রিকেটারের নাম কী

(১৫) যমজ শিশুরা সাধারণত একই রকম দেখতে হয়। কিন্তু কোনও-কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায়, যমজদের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য নেই। বিজ্ঞানের ভাষায় দ্বিতীয় ধরনের যমজদের কী বলা হয় ?

শুভদীপ চট্টোপাধ্যায়, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা।

(১৬) ভারতের আইনসভাকে বলা হয় পার্লামেন্ট। চিন-এর আইনসভাকে কী নামে ডাকা হয় ?

মৌমিতা সাহা, রিষড়া, হুগলি।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

জীবনানন্দ দাশ

(১) ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি. ভি. নরসিংহ রাও।
(২) ববিতা। 'অশনি সঙ্কেত'।
(৩) ১২টি।
(৪) গৌতম ঘোষ।
(৫) বব ডিলান।
(৬) জীবনানন্দ দাশ।
(৭) 'বেন হার'।
(৮) মকবুল ফিদা হুসেন।
(৯) সলমন রুশদি।

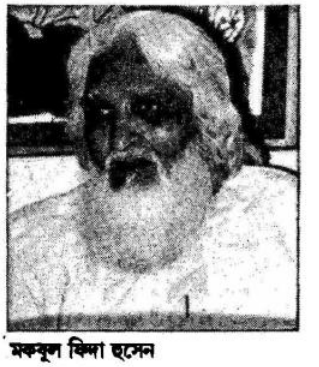

মকবুল ফিদা হুসেন

(১০) ইস্টার সানডে।
(১১) নূপুর।
(১২) প্যাট্রিক র‍্যাফটার।
(১৩) ব্রাজিল ও ফ্রান্স।
(১৪) নিউজিল্যান্ড, আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রেলিয়া।
(১৫) গণেশ পাইন।

প্রশ্ন

(১) 'গিধ্‌ধা' নাচ ভারতের একটি জনপ্রিয় লোকনৃত্যশৈলী। কোন প্রদেশে দেখতে পাওয়া যায় এটি ?
(২) সম্প্রতি কলকাতা ও চেন্নাই শহরকে একটি বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। কী সেটি ?
(৩) মৃণাল সেনের একটি জনপ্রিয় ছবির নাম 'ভুবন সোম'। ছবিটিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কে ? ভারতের কোন অঞ্চলের পটভূমিতে তৈরি হয়েছে এই ছবিটি ?
(৪) ফ্রান্সে বসছে বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর। মোট ক'টি দেশ অংশ নিচ্ছে এবারের বিশ্বকাপে ?
(৫) ফ্রান্স বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী আর্জেন্টিনা দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন কে ?
(৬) দাবায় বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি হিসেবে দেওয়া হয় 'চেস অস্কার' পুরস্কার। এ-বছর এই পুরস্কার পেয়েছেন কে ?
(৭) সত্যজিৎ রায়ের একটি ছবিতে অভিনয় করেছেন সিমি গ্রেওয়াল। কোন ছবিতে ?
(৮) উয়েফা কাপের ফাইনালে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে যে দুটি দল, তারা উভয়েই ইতালির। এর মধ্যে একটিতে খেলেন ব্রাজিলের রোনাল্ডো। কী নাম দল দুটির ?
(৯) ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবা। স্থানীয় ভাষায় শব্দটির অর্থ হল 'সুন্দর ফুল'।
আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আইরেস— এই কথাটির অর্থ কী ?
(১০) ব্রাজিলের ফুটবলদলের কোচ হলেন মারিও জাগালো। সম্প্রতি তাঁকে সাহায্য করার জন্য আর এক প্রাক্তন বিশ্বকাপ ফুটবলারকে নিয়ে আসা হয়েছে। কে তিনি ?
(১১) কমিক্‌সের জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে জাপানের আছে বেশ বড় ভূমিকা। কী নামে ডাকা হয় জাপানি কমিক্‌সকে ?

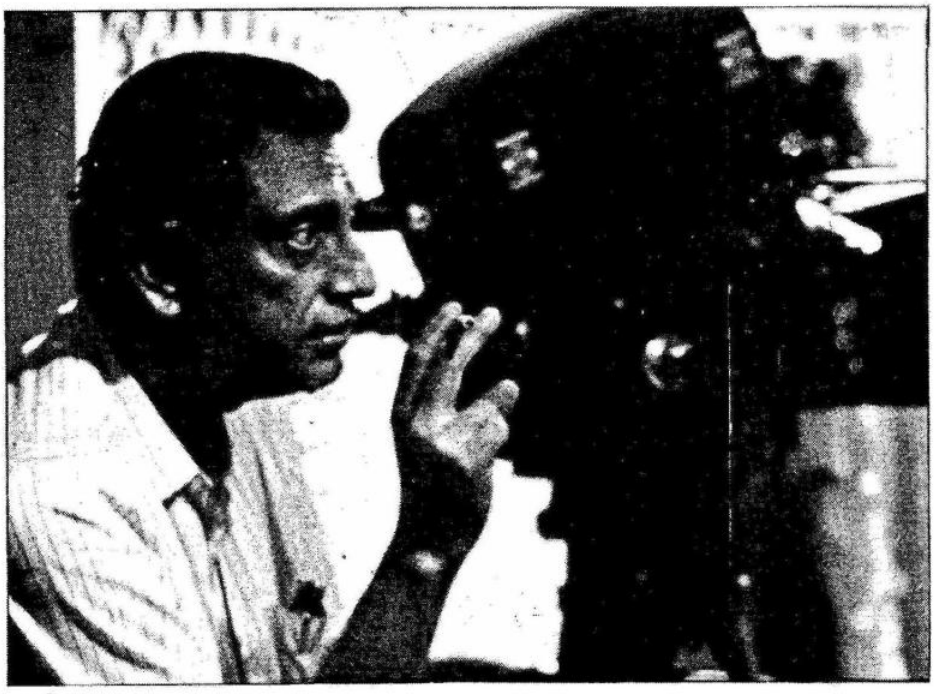

সত্যজিৎ রায়

সুহাসিনী মুলে

(১২) ছবি বিশ্বাস ও পাহাড়ী সান্যালকে নিয়ে সত্যজিৎ রায় তৈরি করেছিলেন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিটি। এ-ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন কে ?
(১৩) প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের একটি ঘরানা এখনও টিকে আছে কেরল-এর একটি নাট্যশৈলীর মধ্যে। কী নাম এর ?
(১৪) নাটকের মধ্যে দিয়ে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রতিবাদ ঘটেছে গত শতকেই। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সেই প্রতিবাদ করা হয়েছিল কোন নাটকে ? নাট্যকার ছিলেন কে ?
(১৫) চিলির এক বিখ্যাত কবি ভারতে এসেছিলেন রাষ্ট্রদূত হিসেবে। কে তিনি ?
(১৬) একদিনের ক্রিকেটে যে-কোনও উইকেটে সর্বোচ্চ রানের 'পার্টনারশিপ'-এর নজির এখন ভারতের দখলে। কোন দুই ব্যাটস্‌ম্যান গড়েছেন এই নজির ?

উত্তর

(১) পঞ্জাব। (২) শহর দুটিকে 'এ-ওয়ান' সিটি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। (৩) সুহাসিনী মুলে। রাজস্থানের মরুভূমি। (৪) ৩২টি। (৫) দিয়েগো সিমোনে। (৬) বিশ্বনাথন আনন্দ। (৭) 'অরণ্যের দিনরাত্রি'। (৮) ইন্টার মিলান ও লাজিও। (৯) সুন্দর বাতাস। (১০) জিকো। (১১) মাঙ্গা। (১২) সত্যজিৎ রায় নিজেই। (১৩) কুডিয়াট্টম। (১৪) 'নীলদর্পণ'। লিখেছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। (১৫) পাবলো নেরুদা। (১৬) মহম্মদ আজহারউদ্দিন ও অজয় জাডেজা।

ট্রেনে ঘুম ভাঙাতে

ট্রেনে উঠে ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যেস অনেকেরই আছে। কারও কারও আবার ঘুম ভাঙে নামার স্টেশন পেরিয়ে যাওয়ার পর। যদি এরকম একটা 'অ্যালার্ম' থাকত যে ঘুম ভাঙিয়ে বলত,"শিগ্‌গির উঠে পড়ুন, মেচেদায় গাড়ি ঢুকছে!" ঘুমকাতুরেদের জন্য সুখবর, সেরকমই একটি অ্যালার্ম তৈরি করে ফেলেছেন কোলচেস্টারের ক্লাইভ ওয়ালিংটন। বিভিন্ন স্টেশনের 'ট্র্যাক কোড' আগে থেকে যন্ত্রের মধ্যে 'প্রোগ্রাম' করা থাকে। নির্দিষ্ট স্টেশন আসার আগেই যন্ত্রটি লাইনের ট্র্যাক থেকে সঙ্কেত পেয়ে যায়, তারপর সেই সঙ্কেতটি নিজস্ব কোডের সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে পারে নির্দিষ্ট স্টেশনটি আসছে কি না। হিতৈষী অ্যালার্ম এবার যাত্রীর ঘুম ভাঙিয়ে বলে, "নামতে হবে, আপনার স্টেশন আসছে।"

তৃষ্ণা বসাক

সমুদ্রের সবচেয়ে লবণাক্ত অঞ্চল

বিভিন্ন লবণের উপস্থিতির জন্য সমুদ্রের জল সাধারণত লবণাক্ত হয়। বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি ক্রিট দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলবর্তী ভূমধ্যসাগরের ৩.৬ কিলোমিটার গভীরে সবচেয়ে লবণাক্ত জলের সন্ধান পেয়েছেন। সেখানকার প্রায় সাড়ে সাত বর্গকিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে আছে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড লবণের ঘন দ্রবণ। এই অঞ্চলটির জল সাধারণ সমুদ্রজলের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশি লবণাক্ত। জার্মানি, ব্রিটেন ও ইতালির গবেষকরা যৌথভাবে এই লবণাক্ত অঞ্চলটি আবিষ্কার করেছেন।

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

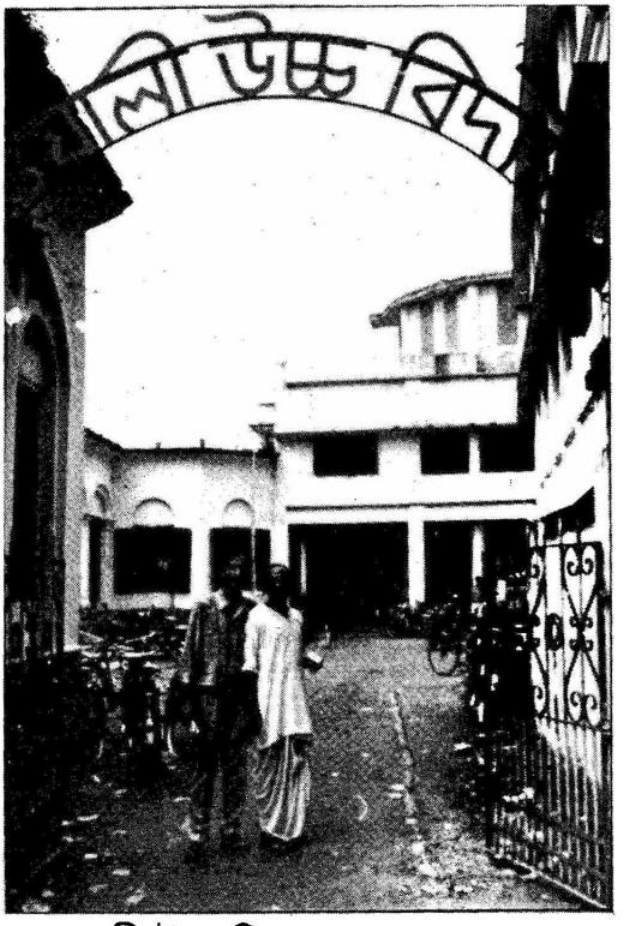

বাওয়ালী উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০০ বছর

ষোলো শতকের শেষের দিকে মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মান সিংহ এসেছিলেন বঙ্গবিজয় অভিযানে। তাঁর বিশাল সেনাবাহিনীর ছাউনি পড়েছিল বারাসাতে। চাঁদ রায়, প্রতাপ রায় প্রমুখ 'বারো ভুঁইয়া'রা সেই বাহিনীকে প্রবল পরাক্রমে বাধা দিয়েছিলেন। বাওয়ালীর পরাক্রমশালী জমিদার দশরথ মণ্ডলও সেই যুদ্ধে যোগ দিয়ে সুখ্যাতি লাভ করেন। বাওয়ালীর মণ্ডল জমিদারদের জমিদারি শুরুর আগেই বহু মউলি-বাউলিরা এখানে বসবাস করতেন। তাঁরা সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে মধু, কাঠ সংগ্রহ ছাড়া মাছ ধরতেও যেতেন। বাউলিদের নাম থেকেই বাওয়ালী গ্রামের নাম হয়েছে। একথা শোনালেন ওই ভূ-স্বামীদের অধুনা উত্তরাধিকারী অরুণ মণ্ডল।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ইতিহাসের ঐতিহ্যময় এই বাওয়ালীতে শিবকৃষ্ণ মণ্ডল এই স্কুলটি স্থাপন করেছিলেন। ১০০ বছরের পুরনো এই স্কুলটির প্রধানশিক্ষক মানবেন্দ্র সমাদ্দার ও উৎসব কমিটির সভাপতি অমিয় দাস জানালেন, পরবর্তীকালে কালীকৃষ্ণ মণ্ডল, ব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও রাজকিশোর মণ্ডল এই স্কুলটিকে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করেছেন।

মশাল দৌড়, প্রভাতফেরির মাধ্যমে এর শতবর্ষ উদ্‌যাপন শুরু হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দিলীপকুমার সিংহ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দু'জন বিশিষ্টমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী ও ক্ষিতি গোস্বামী। সঙ্গীতে ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বনশ্রী সেনগুপ্ত, উৎপলেন্দু চৌধুরী, রমা মণ্ডল ও শুভব্রত দত্ত। শিশুসাহিত্য ও শিক্ষা প্রসঙ্গ আলোচনায় যোগদান করেন শিশুসাহিত্যিক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, ধ্রুব মিত্র (দূরদর্শন), সিদ্ধার্থ সিংহ, বীরেন্দ্রকুমার, শম্ভু সেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পরেশ সরকার।

অনুষ্ঠানের শেষদিনে মেয়েদের প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচের আয়োজন হয় বাওয়ালী ফুটবল মাঠে। শতাব্দীর প্রাচীন এই বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উৎসবে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্ররাও অংশগ্রহণ করেন।

সুনীলবরণ মণ্ডল

শুনতে পাওয়ার ক্ষমতা বাড়াতে কম্পিউটার

যেসব শিশু কানে কম শোনে, তাদের শুনতে পাওয়ার ক্ষমতা বাড়াবার জন্য ইদানীং কম্পিউটারের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। দেখা গেছে, বিশেষ একটি 'উইন্ডোজ সি. ডি. রম'-এর 'প্রোগ্রাম' শিশুদের শুনতে পাওয়ার ক্ষমতা বাড়ায়। এই প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে হবে 'ভিশুয়াল কিউজ অ্যান্ড রিয়্যাল রেকর্ডেড ভয়েস'-এর মাধ্যমে। এতে যে প্রোগ্রাম আছে, তাতে অংশ নিয়েছে ৩ থেকে ১২ বছরের শিশুরা। এই প্রোগ্রাম ব্যবহার করা যায় 'আই-বি-এম স্পিচ ভিশুয়াল টু'-এর মাধ্যমে। আমেরিকার 'সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ডিকশনারি' প্রোগ্রামে আছে 'সাইনিং এন্ড ফিঙ্গার স্পেলিং' যা উইন্ডোজ ৯৫-এর সিস্টেমের নতুন বৈশিষ্ট্য। এটিও কানে কম শোনা শিশুদের সাহায্য করবে। এতে আছে বিশেষভাবে তৈরি 'সাউন্ড সিস্টেম'।

গৌতম হাজরা

প্রকাশিত হয়েছে ক্রিস্টোফার রিভ-এর আত্মজীবনী 'স্টিল মি'

সিনেমার পরদায় কত অসম্ভব ঘটনাই না ঘটিয়ে এসেছেন তিনি। হাত দিয়ে ট্রেন থামিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে মহাশূন্যে উড়ে গিয়ে অবলীলায় পৃথিবীর গতিপথ পালটে দেওয়া— এসব তাঁর কাছে নিছকই তুচ্ছ ঘটনা। এ-কারণেই তাঁর নাম সুপারম্যান। কিন্তু সিনেমা আর বাস্তবের ব্যবধান তো কম নয়। তাই সুপারম্যানের ভূমিকায় অভিনয়ের সুবাদে বিখ্যাত ক্রিস্টোফার রিভকে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে দিন কাটাতে হয় 'হুইলচেয়ার'-এ। কিন্তু ৪৫ বছর বয়সী ক্রিস্টোফার রিভ প্রমাণ করেছেন, মনোবল আর হার-না-মানা জেদের দিক দিয়ে সত্যিই সুপারম্যান তিনি। ঘোড়ায় চড়তে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন ক্রিস্টোফার রিভ। ১৯৯৫ সালের সেই দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয় তাঁর মেরুদণ্ড। সেই থেকে পক্ষাঘাত। এক সময় সবাই ভেবে নিয়েছিলেন, রিভ আর বাঁচবেন না। এমনকী ওঁর মা-ও ধরে নিয়েছিলেন, আর বাঁচানো যাবে না ক্রিস্টোকে। কিন্তু হাল ছাড়েননি রিভের স্ত্রী। মূলত স্ত্রীর অনুপ্রেরণাতেই বেঁচে ওঠার জেদ ছাড়েননি রিভ। ১৯৯৭ সালে হুইলচেয়ারে বসেই রিভ তৈরি করেন কেব্‌ল টিভি-র জন্য 'ইন দ্য গ্লোমিং' ছবিটি। সম্প্রতি প্রকাশিত হল ওঁর আত্মজীবনী 'স্টিল মি'। বইটিতে আছে দুঃস্বপ্নের দিনগুলির এক জীবন্ত বর্ণনা। রিভ সারা পৃথিবীর প্রতিবন্ধী মানুষদের উৎসর্গ করেছেন তাঁর এই আত্মজীবনী।

নাট্যকার বের্টোল্ট ব্রেশটের ১০০ বছর

আজ থেকে ঠিক ১০০ বছর আগে, ১০ ফেব্রুয়ারি জার্মানির আউসবার্গে পৃথিবীবিখ্যাত নাট্যকার বের্ট ব্রেশ্‌ট বা বেটোল্ট ব্রেশট-এর জন্ম হয়েছিল। পুরো নাম ইউজেন বের্টহোল্ড ফ্রেডরিশ ব্রেশ্‌ট। ২৩ বছর বয়সে অক্লেশে নিজের সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, "আমি বুঝতে পারছি আমি একজন 'ক্লাসিক' লেখক হতে চলেছি।" কবিতা তাঁকে ছেলেবেলা থেকেই টানত। সারা পৃথিবীকে তিনি ধরতে চেয়েছিলেন কবিতায়, এমনকী, যার সম্পর্কে তাঁর কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, তাকেও। দেখতেন বন্ধুরা সাঁতার কাটছে। অসম্ভব ভয় ছিল তাঁর জলে। তবু লিখলেন কবিতা, 'অন সুইমিং ইন লেক্‌স অ্যান্ড রিভার্স'। বন্ধুদের গাছে চড়তে দেখতেন। লিখলেন, 'অন ক্লাইম্বিং ট্রিজ'। কবিতাগুলি ১৯২৭-এ বের হল 'হাউস পেসেটিল' (ম্যানুয়াল অব পাইটি) নামে।

কবিতাকে তিনি দেখতেন একান্ত ব্যক্তিগত একটা বিষয় হিসেবে। এর বাইরে বেরোবার তাড়না তাঁকে পাগল করছিল। তার ফসল তিনটি নাটক, 'ব্যল', 'ইন দ্য সোয়াম্প' এবং 'ড্রাম্‌স ইন দ্য নাইট'।

প্রথমটি ছিল এক পাগলাটে, বন্য তরুণকে নিয়ে। দ্বিতীয়টির বিষয় ছিল বাঁচার লড়াই। তৃতীয় নাটক 'ড্রাম্‌স ইন দ্য নাইট' প্রথম মঞ্চস্থ হল ১৯২২-এ। 'প্রিমিয়ার শো'-এর পর সমালোচক হার্বার্ট ইরিং মন্তব্য করলেন, "২৪ বছর বয়সী বের্ট ব্রেশ্‌ট জার্মানির শৈল্পিক মুখকে এক রাতের মধ্যে পালটে ফেললেন।" এই নাটক এবং 'ব্যল'-এর জন্য তিনি পেলেন 'ক্লেইস্ট' পুরস্কার।

এই শুরু—এবং অবশ্যই এ এক উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ। শুরু হল ব্যস্ততাময় জীবন। বার্লিন থেকে

মিউনিখ ছুটে বেড়াচ্ছেন তিনি। রাইনার মারিয়া রিলকে, স্টেফান জর্জ, ফ্রান্স ওয়ের্ফেল, টমাস মান— এঁদের মতো লেখকদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের ঝড় ওঠাচ্ছেন। এদিকে এত পরিশ্রম, অনিয়মিত জীবন এবং ঠিকমতো খাওয়াদাওয়ার অভাবে প্রায়ই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হচ্ছে। ব্রেশটের তিনটি লেখার কথা ভোলা কঠিন, 'থ্রি পেনি অপেরা' (১৯২৮), 'দ্য লাইফ অব গালিলেও' (১৯৩৮), 'মাদার কারেজ অ্যান্ড হার চিলড্রেন' (১৯৩৯)। পৃথিবীর নানা জায়গায় নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়েছে। থ্রি পেনি অপেরায় মনুষ্য-প্রকৃতি বিধৃত। সঙ্গে সঙ্গে আছে ওয়াইমার রিপাবলিকের নৈতিক চিত্রায়ন। নাটকটি ১৯২৯ সালে বার্লিনে ২৫০ বারেরও বেশি মঞ্চস্থ হয়েছে। গালিলেও নাটকে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রবল ক্ষমতা, এবং বিদ্বান ব্যক্তির অক্ষমতার এক অপূর্ব ছবি আঁকা হয়েছে। 'মাদার কারেজ' সাধারণ মানুষের প্রতিভূ, ইতিহাসের শিকার।

লেখার জন্যই ব্রেশটকে দেশছাড়া হতে হয়েছিল। ১৯৩৩-এ নাজি জার্মানি থেকে পালিয়ে ডেনমার্ক, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, রাশিয়া হয়ে আমেরিকায় আসেন তিনি। এই সময়ে অসংখ্য কবিতা ও নাটক লেখেন। মাদার কারেজ এই সময়েরই ফসল।

অনেক খ্যাতিমান মানুষের মতো ব্রেশটের পথও ছিল কঠিন। অনেক কাজই তাঁকে করতে হয়েছে ইচ্ছের বিরুদ্ধে। হলিউডের ছবির জন্য ব্রেশট অনিচ্ছাসত্ত্বেও চিত্রনাট্য লিখেছেন, পয়সার অভাবই ছিল তার একমাত্র কারণ। ভাবলে অবাক হতে হয়, এই প্রতিভাবান মানুষটিকেও কিন্তু নানাভাবে ঠকতে হয়েছে। নিজের লেখা চিত্রনাট্যের জন্য পারিশ্রমিক পাননি, এ তো হয়েছেই, এমনকী তাঁর চিত্রনাট্যও অন্য লোক নিজের নামে প্রকাশ করেছে, এমন ঘটনাও ঘটেছে। এ নিয়ে তাঁর লেখাও আছে।

১৯৪৮ সালে ব্রেশট পূর্ব বার্লিনে চলে আসেন। এখানে এক বছর পরে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'বার্লিনার অনসম্বল'। এর পর আর বেশিদিন তিনি হাতে পাননি। ১০৫৬-এর ১৪ অগস্ট মাত্র ৫৮ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

শমিতা চট্টোপাধ্যায়

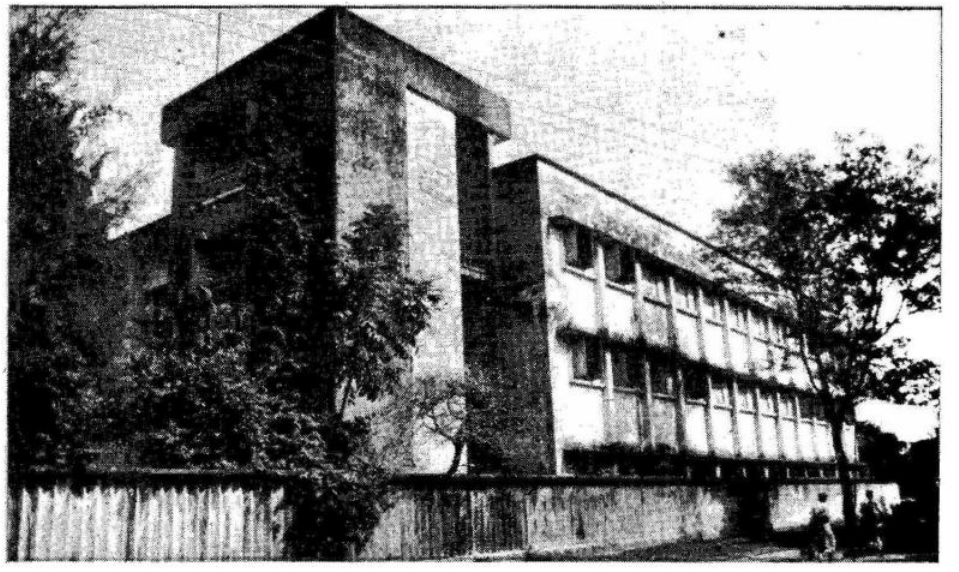

যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুলের বার্ষিক উৎসব

সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার মধুসূদন মঞ্চে যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশতবার্ষিকী পালিত হল। প্রথমে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে শোনায় স্কুলের ছাত্ররা। স্বাগত ভাষণ দেন স্কুলের প্রধানশিক্ষক রবীন্দ্রনাথ সোম। সভাপতি ছিলেন অমলেন্দু দে। বক্তব্য রাখেন স্কুলের সভাপতি সুভাষরঞ্জন চৌধুরী। এই স্কুলের কৃতী ছাত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের যুব কল্যাণ পরিবেশ ও পর্যটনমন্ত্রী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত গায়ক শ্রীকান্ত আচার্য, সরোদবাদক তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, ভাটনগর পুরস্কারে সম্মানিত কঙ্কন ভট্টাচার্য, সর্বভারতীয় নানা পরীক্ষায় কৃতিত্বের অধিকারী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পদক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। মানবেন্দ্রবাবু অবশ্য উপস্থিত হতে পারেননি। স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীকান্ত বেশ কিছু ভাল গান গেয়ে শোনান। '৯৬-'৯৭ শিক্ষাবর্ষে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। এর পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ফাল্গুনী' নাটকের নির্বাচিত অংশ দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করে ছাত্ররা। সবশেষে ছিল প্রধান শিক্ষকের লেখা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য 'তোমার আসন শূন্য আজি'। আন্তরিক এই প্রয়াস সকলের মন ছুঁয়ে যায়।

মণিশঙ্কর দেবনাথ

'টাইটানিক' নিয়ে ডিসকভারি চ্যানেলের অনুষ্ঠান

টাইটানিক ছবিটি তৈরির সময় যে বিশাল কর্মকাণ্ড চলেছিল, ৫ এপ্রিল ডিসকভারি চ্যানেলে দেখানো হল তারই কিছু অংশ। ছবিটিকে বাস্তবের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য যে কী অসম্ভব পরিশ্রম করেছিলেন প্রযোজক জেমস্ ক্যামেরন, আধ ঘণ্টার অনুষ্ঠান 'হার্ট অব দ্য ওশান : মেকিং অব দ্য টাইটানিক' দেখে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সমুদ্রের ১২০০০ ফুট গভীরে জাহাজটির ধ্বংসাবশেষের ভেতর থেকে 'রিমোট কন্ট্রোল'-চালিত ক্যামেরার সাহায্যে কীভাবে ফোটো তোলা হয়েছে, অনুষ্ঠানটি থেকে তা জানা গেল। ৮৬ বছর আগের বাস্তবকে ফিরিয়ে আনার সবরকম চেষ্টাই করেছেন ক্যামেরন। টাইটানিকের ভেতরের সব কিছু, এমনকী নুনদানি, কাঁটাচামচ পর্যন্ত প্রতিটি খুঁটিনাটি যেমন ছিল, সিনেমাতেও হুবহু ঠিক তেমনই রেখেছেন তিনি। ডুবতে শুরু করার পর টাইটানিক ৯০° কোণে লম্বালম্বিভাবে জলের ওপর খাড়া হয়ে উঠেছিল। জাহাজের ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরা তখন সমুদ্রে পড়তে থাকেন অসহায়ভাবে। সিনেমাতেও ঠিক একই ঘটনা দেখিয়েছেন ক্যামেরন। মানুষের পরিবর্তে ছোট-ছোট পুতুল দিয়েই এই কাজটা সারতে হয় তাঁকে এবং এটা করা হয় 'কম্পিউটার গ্রাফিক্স'-এর সাহায্যে।

১২ এপ্রিল ডিসকভারি চ্যানেলের 'টাইটানিক : আনটোল্ড স্টোরিজ' থেকে অনুষ্ঠান জানা গেল ঐতিহাসিক চার্লস হ্যাস-এর নির্দেশ অনুযায়ী 'সাবমার্সিব্‌ল' 'নটিল'-এ

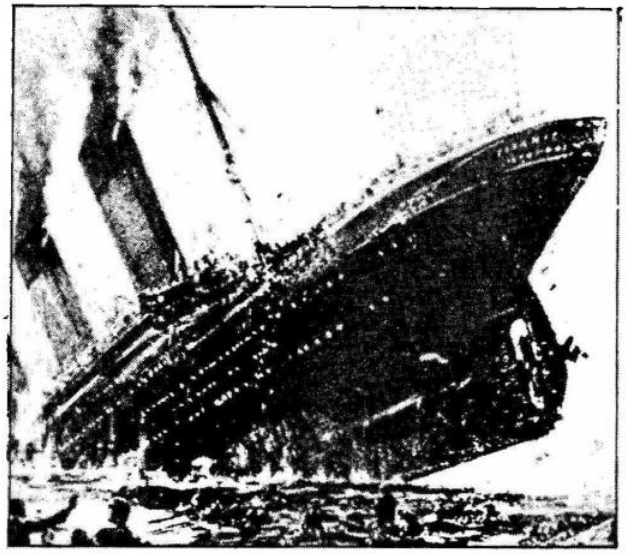

চেপে কীভাবে ১২০০০ ফুট জলের নীচে নেমে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষের কাছে উপস্থিত হন কয়েকজন। জাহাজের ডেক থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি জায়গা খুঁটিয়ে দেখেন তাঁরা।

টাইটানিকের ধ্বংসস্তূপের প্রতিটি ইঞ্চিতে জমে থাকা যন্ত্রণা, আতঙ্ক, আশা-আকাঙ্ক্ষা আর বীরত্বের কাহিনী শুনলাম আমরা এই অনুষ্ঠানে।

জানা গেল হিমশীতল মৃত্যুর মুখোমুখি, কঠিন বাস্তবের সামনে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের উপলব্ধির কথা।

জয় সেনগুপ্ত

ধাঁধা-হেঁয়ালি খামখেয়ালি

এবারের আসরে একজন ভারতীয় গণিতজ্ঞের কথা বলা যাক।

বিস্ময়কর প্রতিভাসম্পন্ন এই গণিতজ্ঞের অতিমানবিক দক্ষতার চাবিকাঠি আজও রহস্যে মোড়া। মাত্র 33 বছরের ছোট্ট জীবনে এমন সব কাণ্ড তিনি ঘটিয়ে ফেলেছিলেন যে, তাঁর গাণিতিক কাণ্ডকারখানাকে ম্যাজিশিয়ানের ম্যাজিক বলাটাই বোধ হয় ভাল।

বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত নিয়ে এই গণিতজ্ঞও মাথা ঘামিয়েছিলেন। π-এর মান নির্ণয়ের জন্য যেসব সূত্র ও সমীকরণ তিনি 'উপহার' দিয়েছিলেন, সেগুলো কী করে যে তিনি ভেবে পেয়েছিলেন তা এক হাজার শার্লক হোম্‌সের পক্ষেও তদন্ত করে বের করা সম্ভব নয়। যেমন, π-এর মান নির্ণয়ের সবচেয়ে সহজ সূত্রটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন এইভাবে :

$$\pi \approx \left(9^2 + \frac{19^2}{22}\right)^{1/4}$$

$$= 3.14159265262$$

এই সূত্রটি দশমিক চিহ্নের পর আট ঘর পর্যন্ত নির্ভুল উত্তর দেয়। এতক্ষণে তোমরা নিশ্চয়ই চিনে ফেলেছ রহস্যময় এই ভারতীয় প্রতিভাকে! তিনি হলেন শ্রীনিবাস রামানুজন (জন্ম : 1887 সাল— মৃত্যু : 1920 সাল)।

দক্ষিণ ভারতের এক অত্যন্ত গরিব পরিবারে রামানুজনের জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অঙ্ক-পাগল। অঙ্কের এই নেশার জন্য কলেজের পরীক্ষায় তিনি ফেল করেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশত তাঁর কয়েকটি গবেষণাপত্র 'জার্নাল অব দ্য ইন্ডিয়ান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি'-তে প্রকাশিত হয়। 1914 সালে তিনি লন্ডনের ট্রিনিটি কলেজে যান। তাঁর এই লন্ডন যাওয়ার পেছনেও রয়েছে একটি অদ্ভুত ঘটনা।

1913 সালে রামানুজন তাঁর বেশ কিছু বিচিত্র গাণিতিক 'আবিষ্কার'-এর নমুনা তিনজন নামী ইংরেজ গণিতজ্ঞের কাছে পাঠান। তার মধ্যে দু'জন রামানুজনকে উন্মাদ ভেবে পাত্তা দেননি। কিন্তু তৃতীয়জন, প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ জি. এইচ. হার্ডি, রামানুজনের চিঠি ও আবিষ্কারগুলো পেয়ে ভাবলেন, "...ওগুলো নিশ্চয়ই ঠিক, কারণ, তা না হলে শুধুমাত্র কল্পনাশক্তি দিয়ে কারও পক্ষে ওগুলো আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।" তারপর হার্ডির উদ্যোগেই রামানুজন লন্ডনে যান। সেখানে গণিত বিষয়ে গবেষণা করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন তিনি। রামানুজনের গবেষণার কয়েকটি বিষয় হল : মডিউলার ইকুয়েশান, হাই কম্পোজিট নাম্বার্স, ডেফিনিট ইন্টিগ্রালস, মডিউলার ফাংশন, হাইপারজিয়োমেট্রিক ফাংশন ও পাই-এর মান নির্ণয়।

1918 সালে রামানুজন রয়াল সোসাইটির 'ফেলো' নির্বাচিত হন। একই বছরে ট্রিনিটি কলেজও তাঁকে 'ফেলো'-র সম্মান দেয়। এর পরের বছর শারীরিক অসুস্থতার জন্য রামানুজন ভারতে ফিরে আসেন। ভগ্নস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে-করতেই 1920 সালে তিনি প্রয়াত হন। রামানুজনের প্রতিভাকে সম্মান জানাতে ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ইউরোপে প্রকাশিত হচ্ছে একটি নতুন গণিত গবেষণা পত্রিকা। পত্রিকাটির নাম 'দ্য রামানুজন কোয়ার্টারলি'।

π-এর মান নির্ণয়ের জন্য রামানুজন যেসব বিচিত্র সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন তার কয়েকটি নমুনা নীচে পেশ করলাম।

তারপর নেমে পড়ব ধাঁধার আসরে।

$$\frac{\pi}{2}\log 2 = 1 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3^2} + \frac{1.3}{2.4}\cdot\frac{1}{5^2}\ldots.$$

$$\frac{105}{\pi^4} = \left(1+\frac{1}{2^4}\right)\left(1+\frac{1}{3^4}\right)\left(1+\frac{1}{5^4}\right)\ldots.$$

$$\frac{1}{2\pi\sqrt{2}} = \frac{1103}{99^2} + \frac{27493}{99^6}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1.3}{4^2} + \frac{53883}{99^{10}}\cdot\frac{1.3}{2.4}\cdot\frac{1.3.5.7}{4^2.8^2} +$$

❑ মনে-মনে সমাধান

নীচে দুটো সমীকরণ দেওয়া আছে। কাগজ-কলম ছাড়াই সমীকরণ দুটোর সমাধান করে x ও y-এর মান বের করতে পারো ?

$6751x + 3249y = 26751$

$3249x + 6751y = 23249$

না, এটা ঠাট্টা নয়। সত্যি-সত্যিই মনে-মনে এর সমাধান করা যায়। একটু চেষ্টা করে দ্যাখোই না! আর, তোমাদের প্রতি এটুকু বিশ্বাস আমার আছে যে, কাগজ-কলম ছাড়াই তোমরা সমীকরণ দুটো সমাধান করার চেষ্টা করবে।

❑ ফ্রিজের বরফের বাক্স

ফ্রিজ থেকে বরফের কিউব বের করে শরবত তৈরি করে খাওয়ার ব্যাপারে তোমরা নিশ্চয়ই যথেষ্ট ওস্তাদ। আর তোমরা নিশ্চয়ই জানো, ফ্রিজের আইসবক্সটা ওপরদিকে থাকে— নীচে নয়। বলতে পারো, কেন ?

❑ ছেলেমানুষি সমস্যা

কোন কথাটি ঠিক— Kindergarten, না Kindergarden? ব্যাখ্যা করে উত্তরটি বুঝিয়ে দাও।

❑ তিন অক্ষরের রহস্যময় শব্দ

তিন অক্ষরের এমন একটা শব্দ খুঁজে বের করো যেটা নীচে বাঁ দিকের স্তম্ভে লেখা তিনটি শব্দকে ঠিকমতো শেষ করবে, আর ডান দিকের স্তম্ভে লেখা তিনটি শব্দকে.

কুপন

উত্তরদাতার কুপন

ধাঁধা-হেঁয়ালি খামখেয়ালি

আনন্দমেলা

২০ মে ১৯৯৮

এই কুপনটি উত্তরের সঙ্গে থাকা চাই। ফোটোকপি গ্রাহ্য হবে না।

ঠিকমতো শুরু করবে।

ROT — BAT — FAT → □ □ □ ← ANT — DON — ON

২৫ মার্চ সংখ্যার উত্তর

❑ **দুইয়ে-দুইয়ে বত্রিশ**

এই সমস্যাটির সমাধান হল—

$$\sqrt[0.2]{2} = 32$$

-অর্থাৎ,

$$(2)^{\frac{1}{0.2}} = 2^5 = 32$$

❑ **অক্ষর সাজানোর সমস্যা**

R, A, C, E —এই চারটি অক্ষরকে মোট 4! (ফ্যাকটোরিয়াল ফোর) অথবা 24 রকম ভাবে সাজানো যায়। কারণ, $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 \times = 24$ । এই 24টি শব্দের মধ্যে অর্থপূর্ণ শব্দ পাওয়া যায় মাত্র চারটি : RACE, ACRE, ACER ও CARE. অতএব, অর্থপূর্ণ শব্দ পাওয়ার সম্ভাবনা $\frac{4}{24} = \frac{1}{6}$ ।

ছবি : দেবাশিস দেব

সঠিক উত্তর যারা দিয়েছে

রজত দাশ (সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা), শ্রীমানেন্দু ভট্ট (কলকাতা-৩৫), প্রসেনজিৎ বিশ্বাস (শিলিগুড়ি), দেবরঞ্জন সরকার (কলকাতা-৬৪), অত্রি মণ্ডল (কলকাতা-৯) ও সুমন পাইন (কলকাতা-৩৩)।

এবারের সেরা উত্তরদাতা
শুভদীপ চট্টোপাধ্যায়
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এবারে ধাঁধা কিছুটা সহজ থাকার জন্যে তোমাদের কাছ থেকে অনেক বেশি সংখ্যায় উত্তর আশা করেছিলাম— কিন্তু তা পাইনি। চিঠি কম পাওয়ার এই 'ধাঁধা'টা নিয়ে যখন ভাবছি তখন হঠাৎই মনে পড়ল, এখন তোমরা তো সব পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত। পরীক্ষায় তোমাদের সকলের সাফল্য কামনা করি।

ধ্রুবজ্যোতি সাহা (পানিহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা) এই আসরের সবাইকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। ও লিখেছে, ইংরেজি নববর্ষেও ও আমাদের শুভেচ্ছা-কার্ড পাঠিয়েছিল, কিন্তু সম্ভবত ডাক-গোলযোগের জন্য সেটা আমার হাতে এসে পৌঁছয়নি।

অধিজিৎ চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা-৩৮) এই আসরে ওর সুচিন্তিত মতামত পাঠিয়েছে, সেই সঙ্গে জানিয়েছে 'শুভ বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা'। ও অভিযোগ করে জানিয়েছে যে, এর আগে ও বহু চিঠি পাঠিয়েছে কিন্তু তার একটার কথাও আমি এই আসরে উল্লেখ করিনি। যতদূর মনে পড়ছে, আগে কখনও আমি অধিজিতের চিঠি পাইনি— পেলে নিশ্চয়ই মনে থাকত— বিশেষ করে ওর সুন্দর নামটার জন্যে। অধিজিৎ আরও লিখেছে, ওর নাম এই আসরে প্রকাশিত হলে ও হবে 'পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী'। ওর এই ভালবাসাকে ধন্যবাদ জানাই।

এবারের উত্তর নিয়ে দু-একটা কথা বলি।

'অক্ষর সাজানোর সমস্যা'টি আমি সংগ্রহ করেছিলাম ফিলিপ কার্টার ও কেজ রাসেল-এর একটি বই থেকে। কার্টার ও রাসেল ব্রিটিশ মেনসার (MENSA) সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে জড়িত। তাঁদের দেওয়া উত্তরে আমি ACER শব্দটি পেয়েছি— অথচ বেশ কয়েকটি অভিধান ঘেঁটেও শব্দটির অর্থ খুঁজে পাইনি। তখন অনুমান করেছি, ACE থেকে হয়তো শব্দটি তৈরি হয়েছে। তোমরা যদি এ-বিষয়ে খোঁজ পাও তা হলে আমাকে নিশ্চয়ই জানাবে। সুতরাং সঙ্গত কারণেই উত্তরদাতাদের কেউই ACER শব্দটির কথা বলেনি। ফলে ওদের উত্তর হয়েছে $\frac{3}{24}$ বা $\frac{1}{8}$

অনীশ দেব

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

ধাঁধা-হেঁয়ালি খামখেয়ালি

আনন্দমেলা

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০১

Waterrelief!

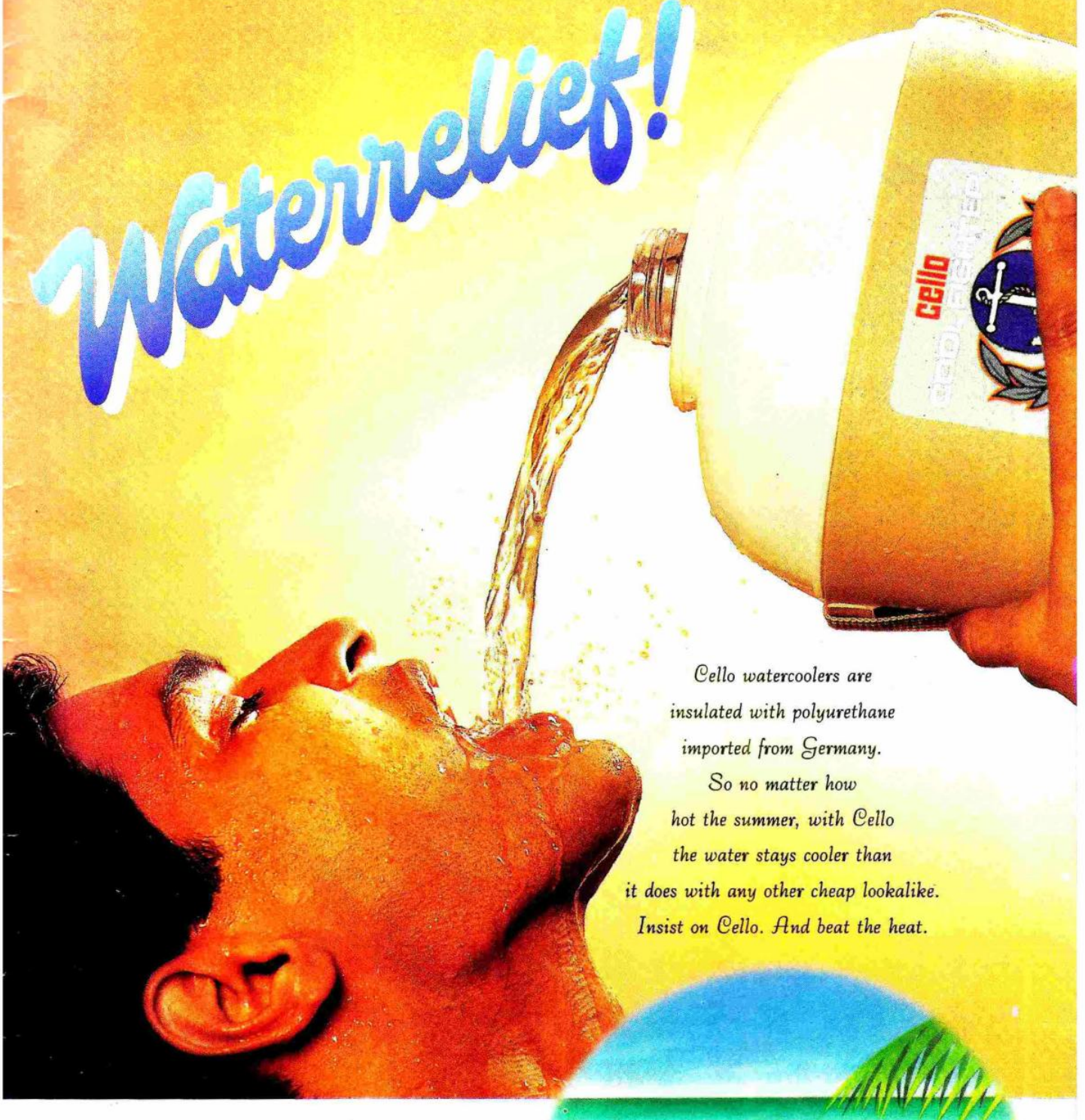

Cello watercoolers are insulated with polyurethane imported from Germany. So no matter how hot the summer, with Cello the water stays cooler than it does with any other cheap lookalike. Insist on Cello. And beat the heat.

cello THERMOWARE *WaterCoolers*

Better by degrees

Insulated with polyurethane imported from Bayer, Germany. Available in many delightful colours, in sizes ranging from 250ml to 10lts.

Situations/CT/7/98

ANANDAMELA 20 MAY 1998 REGD. NO. WBACC7264
MH/MBI-SOUTH/683/97 TN/MS(C) 731. RS. 15.00

কোথায় পাবেন এমন সাদা!

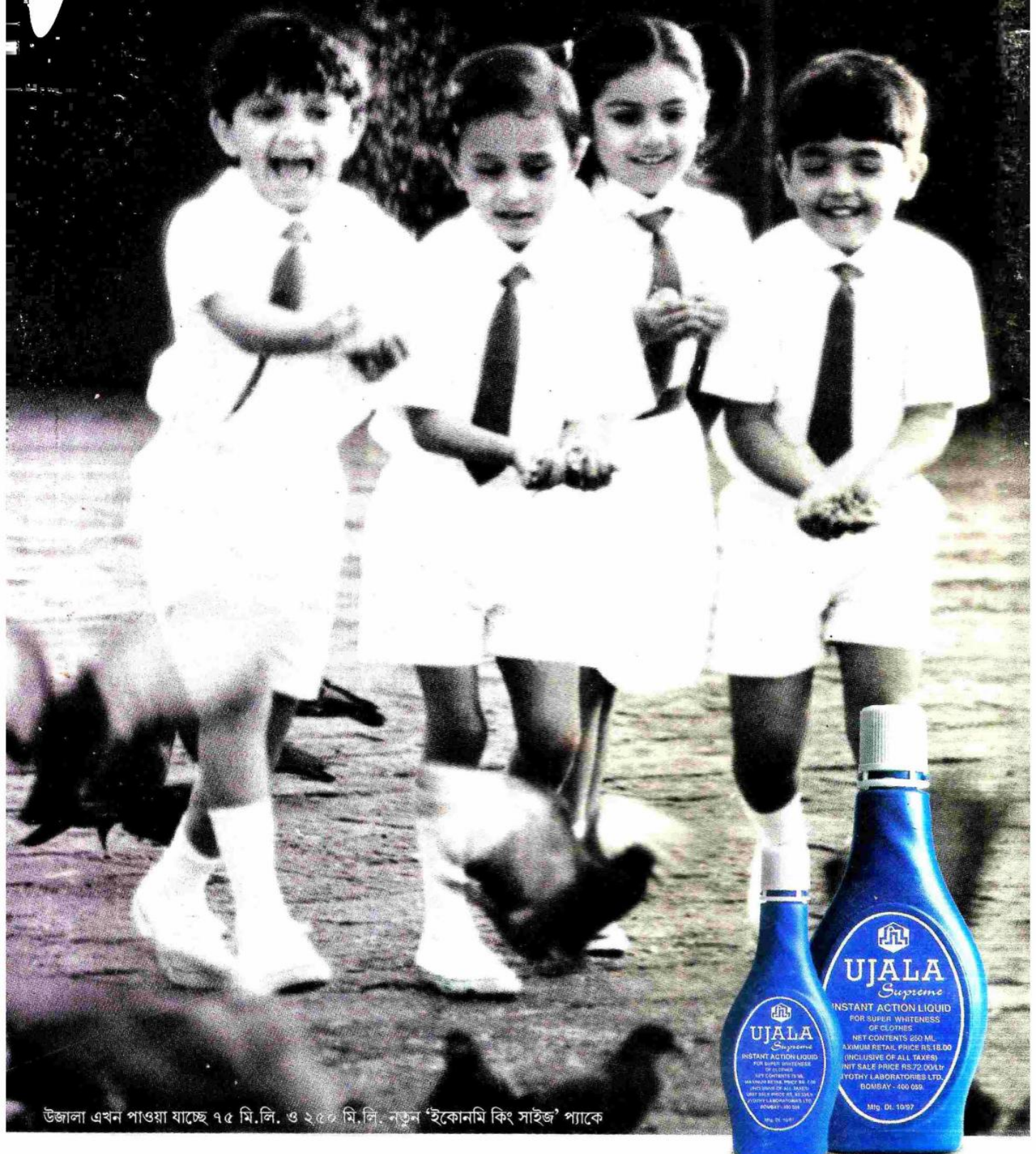

উজালা এখন পাওয়া যাচ্ছে ৭৫ মি.লি. ও ২৫০ মি.লি. নতুন 'ইকোনমি কিং সাইজ' প্যাকে

A product of Jyothy Laboratories Ltd.

চার ফোঁটায় চমক